শয়তানের হাতিয়ার রোমান্টিকতা

হারুন ইয়াহিয়া

খোশরোজ কিতাব মহল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

শয়তানের হাতিয়ার রোমান্টিকতা

তারা বলবে ঃ "হে আমাদের রব! আমরা
দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা
ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।"
[কোরআন : ২৩ : ১০৬]

মূল
হারুন ইয়াহিয়া

ভাষান্তর
প্রফেসর গোলাম মোরশেদ
ডাঃ উম্মে কাউসার হক

খোশরোজ কিতাব মহল

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

বইটিতে ব্যবহৃত কোরআনের সব আয়াতসমূহের বঙ্গানুবাদ
নেয়া হয়েছে ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত
খোশরোজ কিতাব মহল কর্তৃক প্রকাশিত কোরআন শরীফ থেকে

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১১

মূল্য : একশত আশি টাকা

মুদ্রণে
মহীউদ্দীন আহমদ
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯ হৃষিকেশ দাস রোড
ঢাকা - ১১০০

"Shoitaner Hatiar : Romantikota" Bengali translation of ROMANTICISM : A WEAPON OF SATAN by Harun Yahya, Published by Khosroz Kitab Mahal, 15 Banglabazar, Dhaka. Bangladesh, 2nd Edition January 2011
Price : Tk. 180.00 only

শয়তানের হাতিয়ার রোমান্টিকতা

সূচী

মুখবন্ধ	১৭
অবতরণিকা	২১
বৈধ ও অবৈধ ভালবাসা	২৫
রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ	৩১
রোমান্টিকতার বিবিধ ভাবাদর্শ	৪৯
ধর্মের নামে রোমান্টিকতা	৫৭
ঈমান থেকে আসে যে প্রকৃত বিচক্ষণতা	৮১
বিবিধ রোমান্টিকতা	১০৩
আবেগপূর্ণ (রোমান্টিক) ভালবাসার ধারণা	১৩১
শারীরিক অসুস্থতার কারণ : রোমান্টিকতা	১৪৫
উপসংহার : রোমান্টিকতার ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায়	১৫৩
বিবর্তন মতবাদের ভ্রান্ত ধারণা	১৬১

লেখক পরিচিতি

লেখক "হারুন ইয়াহিয়া" ছদ্মনামে লেখালেখি করছেন। তিনি ১৯৫৬ সনে আংকারায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখক ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান ইউনিভার্সিটিতে আর্টস এবং ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে দর্শন শাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি রাজনৈতিক, বিশ্বাস-সংক্রান্ত ও বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারগুলো নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছেন। গ্রন্থকার হিসেবে হারুন ইয়াহিয়া একটি সুপরিচিত নাম; যিনি বিবর্তনবাদীদের প্রবঞ্চনা, তাদের দাবিসমূহের অসিদ্ধতা আর ডারউইনবাদ এবং রক্তপাতে বিশ্বাসী ভাবাদর্শের মধ্যকার যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ফাঁস করে দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

তার ছদ্মনাম হারুন ও ইয়াহিয়া এ দু'টি নাম নিয়ে গঠিত। দু'জন শ্রদ্ধেয় নবীর নাম থেকে এ দু'টি নাম নেয়া হয়েছে। যে নবীদ্বয় অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। লেখকের বইগুলোর প্রচ্ছদসমূহে যে সীল রয়েছে তা এদের বিষয়সমূহের সংযোগে প্রতীকী অর্থ বহন করে। এ মোহর আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ গ্রন্থ ও বাণী হিসেবে কোরআনকে আর হযরত মুহম্মদ (দঃ)-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে তুলে ধরে। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে লেখক তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে এটা ধরে নিয়েছেন যে, তিনি যেন অবিশ্বাস জন্মানো ভাবাদর্শগুলোর প্রতিটি মৌলিক বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করেন আর এমনভাবে তিনি তাঁর শেষ কথা বলে দিতে চান যা-কিনা ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ করে দিতে পারে। সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জনকারী নবী (সঃ)-এর সীল বা মোহরটি লেখকের এই শেষ কথা বলার নিয়ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

লেখকের সমস্ত কার্যাবলীই একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। যা হল – মানুষের কাছে কোরআনের বার্তা পৌঁছে দেয়া। আকীদা ও মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত বস্তুগুলো যেমন – আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব ও পরকাল – এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, আর তাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া।

লেখক হারুন ইয়াহিয়া অসংখ্য দেশ যেমন – ভারত, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, বসনিয়া, স্পেন, ব্রাজিল ইত্যাদি নানা দেশের পাঠকদের অনুরাগ অর্জন করেছেন। অসংখ্য ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। ইংরেজি, ফরাসী, জার্মানী, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী, আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, বসনিয়ান, তার্কিশ ভাষায় অনূদিত বইসমূহ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায়ও তাঁর বই পাওয়া যাচ্ছে।

অত্যন্ত স্বীকৃত এই সৃষ্টিকর্মগুলো পৃথিবীর সর্বত্র, বহুলোকের ক্ষেত্রে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করতে ও অন্যান্য বহু লোকের বেলায় তাদের ঈমানের গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করার ক্ষেত্রে নিমিত্ত বা উপায় স্বরূপ কাজ করছে। এ বইগুলোতে যে প্রজ্ঞা আর আন্তরিক ও সহজ বোধগম্য শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে তা বইগুলোতে এক স্বতন্ত্র ছোঁয়া রেখে গিয়েছে – ফলে যারা এই বইগুলো পড়ে ও পর্যবেক্ষণ করে তাদেরকে বইগুলো প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দেয়। আপত্তিমুক্ত এ লেখাগুলোতে দ্রুত কার্যকারিতা, সুস্পষ্ট ফলাফল, অকাট্যতা এসব গুণাবলী মণ্ডিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। এ বইগুলোতে যে ব্যাখ্যাবলী প্রদান করা হয়েছে তা অবশ্য স্বীকার্য, সুস্পষ্ট এবং আন্তরিক। এগুলোর সুস্পষ্ট উত্তরে পাঠকগণের মনোন্নয়ন ঘটে। যারা এ বইগুলো পড়বেন আর অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করবেন তাদের পক্ষে আর কখনো আন্তরিকভাবে বস্তুবাদ দর্শন, নাস্তিকতা আর অন্যান্য যে কোন ধরনের বিকৃত ভাবাদর্শ কিংবা দর্শনকে আন্তরিকতাপূর্ণভাবে সমর্থন করা সম্ভব হবে না। এমনকি যদিও তারা সমর্থন করেই যায়, এগুলো হবে কেবল ভাবাবেগপূর্ণ জেদেরই প্রমাণ। কেননা, এ বইগুলো উক্ত ভাবাদর্শগুলোকে অত্যন্ত মূল বা ভিত্তি হতেই অসত্য বা অমূলক প্রতিপন্ন করে। হারুন ইয়াহিয়ার লেখা বই গুচ্ছগুলোর বদৌলতে সমসাময়িক সব ধরনের অস্বীকারের আন্দোলন আজ আদর্শগতভাবেই পরাজিত হয়েছে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলী এদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও সহজবোধ্যতারই ফলস্বরূপ। এটা নিশ্চিত যে, লেখক নিজে কখনো গর্বিত বোধ করেন না। তিনি কেবল আল্লাহর সঠিক পথ সন্ধানের ক্ষেত্রে কারো উপায় হিসেবে সাহায্য করার নিয়ত করেন। অধিকন্তু লেখক তার বইগুলো থেকে পার্থিব অর্জনের চেষ্টা করেন না। এ লেখক তো নয়ই, এমনকি অন্যান্য যারাই এ বইগুলোর প্রকাশ কিংবা পাঠকদের কাছে পৌছে দেয়ার কাজে জড়িত তারা কেউই পার্থিব কোন লাভ অর্জন করেন না।

এসব তথ্যগুলো বিবেচনা করে যারা মানুষের অন্তরের চোখ খুলে দেয়া আর মানুষকে আল্লাহর আরো অনুগত বান্দা হতে পরিচালনাকারী এ বইগুলো সবাইকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন, তারা নিঃসন্দেহে অমূল্য এক সেবা করে যাবেন।

ইতোমধ্যে, যে বইগুলো মানুষের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, ভাবাদর্শগত গোলমালের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে এবং মানুষের মনের সন্দেহ দূরীকরণের ব্যাপারে যে বইগুলোর সুস্পষ্টভাবে কোন শক্তিশালী ও সঠিক প্রভাব নেই, এগুলোর প্রচার করা কেবলই সময় ও শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, পথহারা মানুষকে মুক্ত করা ছাড়া শুধুমাত্র লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতার উপর জোর দিয়ে রচিত বইয়ের পক্ষে এমন বড় ধরনের প্রভাব ফেলা অসম্ভব। এতে যারা সন্দেহ করেন, তারা সহজেই দেখতে পাবেন যে, হারুন ইয়াহিয়ার বইগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবিশ্বাসসমূহ দুর্বল করে দেয়া আর কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধগুলো ছড়িয়ে দেয়া। এ সেবা কাজগুলো যে ধরনের সাফল্য, প্রভাব কিংবা আন্তরিকতা অর্জনে সহযোগী তা পাঠকদের বিশ্বাস উৎপাদন থেকেই প্রকাশিত হয়।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার – মুসলমানগণ যে অবিরাম নিষ্ঠুরতা, দ্বন্দ্ব আর যেসব অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে, তা ধর্মহীন আদর্শগত প্রচারেরই ফলাফল। এগুলোর অবসান হতে পারে বিশ্বাসহীন ভাবাদর্শের পরাজয়ের মাধ্যমে। এটা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যে, প্রতিটি ব্যক্তি সৃষ্টির রহস্য ও কোরআনের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন জ্ঞান রাখে যেন কোরআনকে মাধ্যম ধরে নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে। পৃথিবীর এখনকার হালচাল বিবেচনা করলে – যা কিনা মানুষকে সহিংসতা, দুর্নীতি ও দ্বন্দ্বের সর্পিল নিম্নগতির দিকে পরিচালিত করতে বাধ্য করেছে – এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কাজটি আরো দ্রুতগতিতে কার্যকরীরূপে করে যাওয়া দরকার। অন্যথায় তখন অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাবে।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, হারুন ইয়াহিয়ার ধারাবাহিক সৃষ্টিকর্মগুলো এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় এ বইগুলো একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের জন্য কোরআনে প্রতিশ্রুত শান্তি ও রহমত, সুবিচার ও সুখের সন্ধান পাওয়ার উপায় বের করবে।

লেখকের সৃষ্টিকর্মগুলো হল ঃ The New Masonic Disorder, Judaism and Free Masonry, Global Free Masonry, Islam Denounces Terrorism, Solution : The values of the Quran, The Winter of Islam and the Spring to come, Romanticism: A Weapon of Satan, For Men of Understanding, The Truth of life of This World, The Nightmare of Disbelief.

The Another Name for Illusion, The Quran leads the way to science, Miracles of the Quran, The Design in Nature, Deep Thinking, Never plead Ignorance, The Miracle in the cell, The Miracle in The immune system, The secrets of DNA ইত্যাদি আরো শতশত বই।

শিশুদের উদ্দেশ্যে লেখকের বইগুলো হল : Wonders of Allah's Creation, The World of Animals, Let's Learn our Religion, The Glory in The Heavens, The Ants, The Honeybees that build Perfect Combs.

কোরআনের বিষয়ের উপর লেখা লেখকের অন্যান্য বইগুলো হল : The Basic Concepts in the Quran, The Moral Values of the Quran, Devoted To Allah, The Real home of Believers : Paradise ; Answers from the Quran, Death, Resurrection Hell, The Importance of Conscienc in the Quran, The Arrogance of Satan, Prayers in the Quran, Before you regret, The Alliance of The Good, Some Secrets of the Quran, Taking the Quran as a Guide ইত্যাদি নানা ধরনের বই।

পাঠকের প্রতি

বিবর্তন থিওরীর পতনের (The collapse of the Theory of Evaluation) জন্য কেন একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোগ করা হল তার কারণ --- এই থিওরীটিই সব ধরনের আধ্যাত্মিকতা বিরোধী দর্শনগুলোর ভিত্তি নির্মাণ করে থাকে। ডারউইনবাদ (Darwinism) সৃষ্টির সত্যকে অস্বীকার করে, সেভাবেই তা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকেও প্রত্যাখ্যান করে। বিগত ১৪০ বছর ধরে এই ডারউইনবাদ বহু লোকের ক্ষেত্রে তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করার কিংবা সন্দেহ বা সংশয়ে পতিত করার জন্য কাজ করেছে। তাই, এই থিওরীটি যে একটি প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা তা দেখিয়ে দেয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, এটা ধর্মের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত কর্তব্য বা দায়িত্ব। এটি অতীব জরুরী যে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি সবার উপরই বর্তায়। কোন কোন পাঠক হয়ত আমাদের একটিমাত্র বই পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। সুতরাং, এ বিষয়টির সার সংক্ষেপের জন্য একটি অধ্যায় বরাদ্দ করাটাকেই আমরা সঠিক বলে মনে করছি।

লেখকের সবগুলো বইয়েই বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলো কোরআনের আয়াতসমূহের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর মানব সমাজকে আল্লাহ তায়ালার বাণীগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ও সেগুলো অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবগুলো বিষয় এমনভাবে খন্ডন করা হয়েছে যেন তা পাঠকের মনে কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক না করে কিংবা কোন প্রশ্ন রেখে না যায়। এখানে আন্তরিক, সরল আর সাবলীল রচনাশৈলীর ব্যবহার করা হয়েছে যেন প্রতিটি বয়সের এবং সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতিটি মানুষ এই বইগুলো সহজেই হৃদয়ংগম করতে পারে। মনে দাগ কেটে যাওয়া এই সহজবোধ্য বৃত্তান্তসমূহ বইখানিকে পাঠকের পক্ষে একবারে বসে সমাপ্ত করে উঠতে পারাকে সম্ভব করে তুলেছে। এমনকি যারা আধ্যাত্মিকতা বিষয়টিকে প্রচন্ডভাবে অস্বীকার করে তারাও এই বইগুলোতে বর্ণিত প্রকৃত সত্য তথ্যগুলো দিয়ে প্রভাবিত হয় আর তাই এগুলোর বিষয়বস্তুসমূহকে তারা আর অসত্য বা অমূলক বলে প্রতিপন্ন করতে পারে না।

এ বইখানাসহ লেখকের অন্যসব সৃষ্টিকর্মগুলো একাকী পড়া যায় কিংবা দলবদ্ধভাবে আলাপচারিতায় আলোচনা করা যেতে পারে। আর পাঠকগণ, যারা এ গ্রন্থগুলো হতে সুফল পেতে ইচ্ছুক হন, তারা এ অর্থে আলোচনা করাকে খুবই ফলপ্রসূ হবে যে, তারা তাদের নিজেদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতাগুলো একে অপরের কাছে বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন।

তদুপরি, একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে লেখা এই বইগুলো বিভিন্ন উপস্থাপনায় (Presentation) ব্যবহার করে আর পঠনের মাধ্যমে ধর্মের এক বিরাট সেবা করা হবে। লেখকের সবগুলো বই অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করে (আর বিশ্বাসযোগ্য)। এ কারণেই যারা মানবধর্মকে অবহিত করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা হলো – এ বইগুলো পড়ার ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করা।

আশা করা যায় যে, পাঠকগণ বইয়ের শেষের পাতাগুলোয় অন্যান্য কিছু বইয়ের নিবন্ধসমূহে কিছু সময় ধরে চোখ বুলিয়ে যাবেন আর আকীদা (বিশ্বাস) সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সমৃদ্ধ উৎসগুলো – যা কিনা খুবই উপকারী ও পড়তেও আনন্দদায়ক – সেগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করবেন।

এ বইগুলোতে অন্যান্য কিছু বইয়ের ন্যায় আপনি লেখকের ব্যক্তিগত মতামত, সন্দেহপূর্ণ (অনির্ভরযোগ্য) সূত্র হতে নেয়া ব্যাখ্যাবলী, রচনাশৈলী- যা পবিত্র বিষয়ের কারণে সম্মান, গভীর শ্রদ্ধা ও ভয়ের ব্যাপারে অমনোযোগী, হতাশাব্যঞ্জক, সন্দেহ উদ্রেককারী এবং নৈরাশ্যজনক বর্ণনা যা পাঠকের অন্তরে বিচ্যুতির সৃষ্টি করে – এগুলোর কোন কিছুই পাবেন না।

– লেখক

মুখবন্ধ

এ কোরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। [কোরআন : ৩৮ : ২৯]

যে সমাজ ধর্মের অনুশীলন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রায়শই যে ব্যাপারটি ঘটতে দেখা যায় তা হল – যা সত্য তা মিথ্যা বলে বিবেচিত হয়। এর বিপরীতক্রমে, যা মিথ্যা তাকে সত্য বলে ভাবা হয়। আল্লাহ কর্তৃক অননুমোদিত (Disapproved) একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রথাকে উৎসাহিত করতে ও এর উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে এই সমাজগুলো সঠিক বিশ্বাস পদ্ধতিকে 'অপর্যাপ্ত' এমনকি 'অনাকাঙ্খিত' বলেও বিবেচনা করতে পারে। যা বিকৃত তার সঙ্গে সত্যের দ্বন্দ্ব ধর্মহীন সমাজগুলোতে একটি অতি সাধারণ ব্যাপার, যে অবস্থাটি এদের সমাজের ঠিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

রোমান্টিকতা এমনি একটি মিথ্যাবাদ যাকে ভুলক্রমে সত্য বলে ভাবা হয়ে থাকে। যে সমাজে মানুষ ধর্ম অনুসারে জীবন-যাপন করে না, সেখানে রোমান্টিকতাকে দয়ালু ও ভাল লোকের সদ্‌গুণ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। যাই হোক, ভাবাবেগ প্রবণ (Sentimental) কোন কামনা গ্রহণ করে নেয়াটা যে ভয়ংকর একটি 'হৃদয়ানুভূতি' তা এ বইখানিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে দেখানো হবে। আবশ্যকীয়ভাবেই রোমান্টিকতা যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে। কেননা যুক্তি হল রোমান্টিকতা দর্শনের ঠিক বিপরীত আর তাই এ অবস্থা থেকে আমাদের সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এ বইখানির উদ্দেশ্য হল রোমান্টিকতা বিষয়টির আলোচনায় এ সত্যটুকুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যে, যদিও রোমান্টিকতা ক্ষতিকর নয় এমন একটি রূপে আবির্ভূত হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা এমন একটি মনোভাব যা কিছু অদ্ভুত বিপদ বা ঝুঁকির দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। যদিও রোমান্টিকতা সাধারণের বাইরে কোন দৃষ্টিভঙ্গী নয় বলে প্রতীয়মান হতে পারে, তবুও সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি এটা যে মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থান গ্রহণ করতে পারে - তাই এ বইটি দেখিয়ে দিবে। আর আল্লাহ মানব জাতির প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন সেই কোরআনকে একমাত্র পথ চালিকা হিসেবে দর্শন করলে এমন একটি চোরাবালিকে এড়িয়ে যাওয়া যে কত সহজ তা এ বইটি অবশ্যই প্রদর্শন করবে। যখন কেউ কোরআন অনুসরণ করে তখন সে আবেগের উপর ভিত্তি করা নীতিমালার কারণে বিচার-বুদ্ধিকে বর্জন করতে পারে না – এ বিষয়টি স্পষ্টতর করতে গিয়ে আমরা নানাবিধ দৃষ্টান্ত পাঠকের সামনে তুলে ধরব।

অবতরণিকা

তাদের মধ্যে যাদের পার তোমার আহ্বানে পদস্খলিত কর, তোমরা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের সম্পদ সম্পর্কে ও সন্তান- সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তো তাদেরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

[কোরআন : ১৭ : ৬৪]

এমন একটি সূক্ষ্ম বিপদ রয়েছে যা মানুষকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, প্রভু হিসেবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর পরিশেষে তাদের উপর নানা ধরনের অসুবিধা ও কষ্টাদি নিয়ে আসে। আমাদের জীবনে বহুবিধ ক্ষেত্রে আমরা এ বিপদখানা চিনতে পারি ঃ একজন ফ্যাসিষ্ট-এর দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে, একজন কমিউনিস্টের জাগরণী সঙ্গীতে, কিংবা প্রেমিকার কাছে এক তরুণের ভালবাসা জানিয়ে লিখা চিঠির শব্দাবলীতে। এগুলো সবই একই ধরনের অনিষ্টকর উৎস থেকে উৎসারিত হয়।

এ বিপদটির সবচাইতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দিক হল, বিপুল সংখ্যক মানুষ এটাকে মোটেও বিপদ হিসেবে দেখে না ; তারা এটাও বুঝতে পারে না যে, প্রকৃতপক্ষে, এটা সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী মনেরই একটি অবস্থা। আসলে অনেকেই একে বিপজ্জনক ভুল হিসেবে নয় বরং উৎসাহিত করার ও বহুল প্রচারিত হওয়ার মত একটি পুণ্য হিসেবে বিবেচনা করে।

ভাবাবেগ প্রবণতা বা ভাববিলাসিতা হল সেই বিপদ যার কথাই আমরা বলছি। ভাবাবেগ প্রবণতা মানুষকে বিচারবুদ্ধি অনুসারে না চলে নিজেদের খেয়ালখুশী যেমন ঘৃণাবোধ, লোভ-কাতরতা, আর তাদের একগুঁয়েমি ইত্যাদি আবেগ অনুসারে জীবন-যাপনে পরিচালিত করে।

অজ্ঞতার সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভাবাবেগ প্রবণতা – যা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মিলিয়ন মিলিয়ন লোককে এর প্রভাবাধীন করে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে, এটা শয়তানের হাতিয়ারগুলোরই একটি যা মানুষকে আল্লাহর পথ অনুসরণ করা থেকে বিচ্যুত করে। কেননা, যে ব্যক্তি আবেগপ্রবণতার মুঠোয় পতিত হয়ে থাকে, সে তার বিচারবুদ্ধি ব্যবহারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর যখন সে তার বিচারবুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না তখন সে এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, কিংবা, না সে তাঁর (আল্লাহ) নিদর্শন ও উদ্দেশ্যগুলো চিনতে পারে, না সে ধর্মের মহিমাময় সত্যকে অনুসরণ করে জীবন-যাপন করতে পারে। কারো পুণ্যময় জীবন তার বিচারবুদ্ধিকে ব্যবহারের উপরই নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ

"যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" [কোরআন : ৩৮ : ২৯]

আরো সঠিকভাবে, যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে ভাবাবেগ প্রবণতার ব্যাধিটি একজন মানুষের পক্ষে সত্যিকার অর্থে ধর্মকে বুঝার কিংবা অভিজ্ঞতা লাভ কিংবা ধর্মকে উপভোগ করার বিষয়টিকে অসম্ভব করে তুলে। অধিকন্তু, যদি না ভাবাবেগ প্রবণতা রোগটির চিকিৎসা করা হয়, তবে এ দুনিয়ায় বিষয়হীন বিতর্ক, অর্থহীন ভোগান্তি, হামলা, বিপদ ও নিষ্ঠুরতা – যা মানুষ নিজের উপর বয়ে নিয়ে আসে, এসব অবস্থাদির সমাপ্তি ঘটানোকে এ রোগটি অসম্ভব করে তুলবে।

সাম্প্রতিক ইতিহাস ও আমাদের দৈনন্দিন জীবন উভয়ের মাঝে বিদ্যমান এ অজ্ঞতার সংস্কৃতির কিছু উদাহরণ বিবেচনার মধ্য দিয়েই এ বইখানি ভাবাবেগ প্রবণতা বিষয়টির উপর আলোচনা করবে। কোন ব্যক্তিরই নিজেকে এ বিপদ থেকে মুক্ত মনে করা উচিত নয় ; বিপরীতে, শয়তান যে পাঁকে আমাদেরকে বন্দী করার ইচ্ছে করে তার সম্পর্কে প্রত্যেকেরই সতর্ক থাকা উচিত।

বৈধ ও অবৈধ ভালবাসা

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তোমরাতো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করছে। .....

[কোরআন : ৬০ : ১]

ভাবপ্রবণতা বা ভাববিলাসিতা (Sentimentalism) কিংবা অন্য কথায় রোমান্টিক বাসনা বেশির ভাগ সময় "ভালবাসার" ছদ্মাবরণে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণতঃ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখব যে, রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীরা তাদের দেশকে ভালবাসে বলে দাবি করে, যে কারণে তারা অন্যদেশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কিংবা এমনকি আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করে। কিংবা একটি মেয়ের ভালবাসায় আবদ্ধ এক ব্যক্তির উদাহরণ আমরা বিবেচনা করতে পারি, যে কি-না তার ভালবাসাকেই তার জীবনের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, যার ফলে সে মেয়েটির কাছে "আমি তোমায় ভালবাসি" – এ কথাটি বলে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয় আর সে মেয়েটির প্রতি তার মন সর্বদা আচ্ছন্ন থাকায় আত্মহত্যার ব্যাপার পর্যন্ত চিন্তা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটিকে দেবীতে রূপ দেয়াই "ভালবাসার" ধারণা। তারপর সমকামীরা রয়েছে, যারা স্রষ্টার নিষেধাজ্ঞার অধীন দলের অন্তর্ভুক্ত এবং যারা নির্লজ্জের ন্যায় ও দৃঢ়তা সহকারে তাদের বিকৃত কাজটির চর্চা করে থাকে ; তারাও ভালবাসা পেয়েছে বলে দাবি করে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভাবে যে "ভালবাসার" নামে আরোপিত প্রতিটি আবেগই হল পুণ্যাত্মক, বিশুদ্ধ এবং এমনকি পবিত্র, আর আমরা পূর্বে রোমান্টিক প্রণয়ের যে উদাহরণগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণযোগ্য।

প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা হল মানব জাতির প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত একটি চমৎকার আবেগ। তবে সেই ভালবাসা কি কৃত্রিম কিংবা অকৃত্রিম তা পার্থক্য করে নিরূপণ করা, আর কার উদ্দেশ্যে এই ভালবাসা নিবেদিত হচ্ছে ; আর কি আবেগের উপর তা প্রতিষ্ঠিত – এগুলো বিবেচনা করাটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিকৃত ভালবাসার দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় এমন আবেগ আর কোরআনে 'আল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকৃত আবেগ' – এ দুটোর মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যটি এ ধরনের অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে আসবে।

এ বইখানিতে এ বিষয়গুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করব। কিন্তু, সর্বপ্রথম, প্রাথমিক তথ্য হিসেবে চলুন আমরা কোরআনে ভালবাসার যে অর্থ পাওয়া যায় তা প্রদান করি। পবিত্র কোরআন অনুযায়ী ভালবাসা পাবার যোগ্য ব্যক্তির প্রতিই ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত। যারা এর যোগ্য নয় তাদেরকে ভালবাসাও উচিত নয়। এমনকি আমাদের নিজেদেরকেও আবেগপ্রবণ হয়ে

তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত কিংবা ন্যূনতম পক্ষে, তাদের প্রতি আমাদের কোন ধরনের ঝোঁক বা তাগিদ অনুভব করা উচিত হবে না। কিন্তু ভালবাসার যোগ্য ব্যক্তিগণ তাদের গুণের কারণেই তা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

একমাত্র আল্লাহ, যিনি আমাদের সবাইকে সৃজন করেছেন, তিনিই কেবল অবিমিশ্র (Absolute) ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আল্লাহ আমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন, আমাদের দান করেছেন অগণিত নিয়ামতসমূহ - যা আমরা ভোগ করি, আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং আমাদের নিকট চিরস্থায়ী বেহেশতের অঙ্গীকার প্রদান করেছেন। প্রতিটি দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হতে তিনি আমাদের সহায়তা করেন এবং আমাদের প্রতিটি প্রার্থনা তিনি সদয়ভাবে শুনে থাকেন। আমরা পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই আমাদের খাওয়ান, আমরা পীড়িত হলে তিনিই আমাদের আরোগ্য করেন এবং তারপর আবার আমাদের উদ্যম ফিরিয়ে আনেন। অতএব, যে ব্যক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য বুঝে, সে সবার উপরে আল্লাহকেই ভালবাসে এবং সেরূপ লোকদেরও ভালবাসে যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। আর যে সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেন – তাদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন।

অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহী সীমালংঘনকারীরা ভালাবাসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এ সকল লোকের জন্য ভালবাসা পোষণ করা গুরুতর ভুল। নিম্নলিখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণকে এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে বলেছেন ঃ

> "ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে মক্কা থেকে নির্বাসিত করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি তোমরা বের হয়ে থাক আমার পথে জেহাদ করার উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তবে কেন গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাও? আর তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি ভাল জানি। তোমাদের যে কেউ এরূপ করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"
>
> [কোরআন : ৬০ : ১]

উপরের আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের জন্য কোন প্রকার ভালবাসা রাখা মুমিনগণের উচিত নয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা উচিত – এমনকি যদিও একজন ঈমানদার ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী কোন ব্যক্তির জন্য নিজের অন্তরে ভালবাসা অনুভব করে না, কিন্তু তবু সে সেই ব্যক্তিটিকে ঈমানদার বানিয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী হিসেবে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিজের সর্বক্ষমতাই নিয়োগ করবে। এরূপ ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী লোকের জন্য "ভালবাসা পোষণ না করার" অর্থ এটি নয় যে তার প্রতি ঘৃণা বোধ করা উচিত, কিংবা তার মঙ্গল কামনা করা উচিত নয়। পরন্তু, আল্লাহতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ কোন সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি কোন দিক নির্দেশনা পেতে ইচ্ছুক নয় – এই উভয় ধরনের ব্যক্তির সামনে ধর্মের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরবেন। যে মোমিন ঐ ব্যক্তিটিকে বেহেশ্‌ত ও দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, তাকে মৃত্যু, শেষ বিচারের দিন ও পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করবেন – তিনি আসলেই যত্ন ও করুণার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

তদুপরি, এমনকি যদিও সবধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ না করে তবে সে ব্যাপারটি কোন মুসলমানকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করাতে বাধা দেয় না। যদিনা কোন ব্যক্তি কোন মুমিনকে আঘাত করার চেষ্টা করে, কিংবা মানুষের মাঝে সংঘাত ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না করে, তবে মুমিন ব্যক্তিটির উচিত হবে সমান সহিষ্ণুতা সহকারে সকলের সঙ্গে আচরণ করে যাওয়া, কেননা আল্লাহ তাঁর মোমেন বান্দাগণকে একটি আদেশ করেছেন ঃ

> **"আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না সদ্ব্যবহার ও ন্যায়াচরণ করতে তাদের সাথে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়নি। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়চারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন কেবল ঐ সকল লোকের সঙ্গে যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। যারা এদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তো হবে প্রকৃত জালিম।"**
>
> [কোরআন : ৬০ : ৮-৯]

উপরের আয়াতসমূহে এবং পূর্বে উল্লিখিত অপর একটি আয়াতে (কোরআন, ৬০ : ১) আল্লাহ তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞায়, একটি বিষয় আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন – যা উপলব্ধি করাটা অত্যন্ত জরুরী। অবশ্যই কোন ব্যক্তির আচরণ

আবেগ দিয়ে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, কেননা, এতে তারা মহাভ্রান্তিতে নিপতিত হতে পারে। অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে নিজের আবেগ অনুসারে নয় বরং বিচারবুদ্ধি, নিজের মুক্ত আকাংখা ও আল্লাহর আদেশ অনুসারে কাজ করা উচিত। অধিকন্তু একজনকে তার যুক্তি ও ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করার জন্য তার আবেগকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ভাব বিলাসিতার খানাখন্দকে পতিত হয়েছে এমনসব ব্যক্তিদের মাঝে এ যে অভাবটি রয়েছে – তা আমরা চিনে নিতে পারি। শত শত মিলিয়ন লোক তাদের অন্তরের আকাংখা, তাদের লক্ষ্য, আবেগ-ঘৃণা ও রাগের দাস হয়ে আছে। তারা অযৌক্তিকভাবে কাজ করে, আর তাদের নিজেদের অসহায় বলে দাবি করে, তাদের কর্মগুলো ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করে তারই উদাহরণ স্বরূপ তারা বলে ঃ "আমি তা না করেই পারি না", "আমি ঠিক এটিই চাই।" কিংবা "আমি না করে পারি না" আমি এটা চাই, আমি এটাতেই আগ্রহী।" কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল যে, এক জনের কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা"- এর মানে এই নয় যে, সে ব্যাপারটা ভাল কিংবা বৈধ হবে। আমাদের ভিতরকার সত্ত্বাটি সবসময় আমাদেরকে খারাপ কাজ করার প্ররোচনা যোগায়, আর শয়তানের সাহায্য নিয়ে তা এমনকি আরো বৃহত্তর ভুল করার জন্য উস্কানি দিতে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে কোন কাজ করে আর বলে, "আমি এটা না করে পারলাম না", "আমি এটাই চাই"- তখন তার ভিতরকার সত্ত্বাটি প্রকৃতপক্ষে শয়তানের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এ সকল লোকের কথা নিম্নরূপে বলেছেন ঃ

> **"আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? আর আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন ও তার কানের ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর রেখে দিয়েছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ দেখাবে ? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ?"**
>
> [কোরআন : ৪৫ : ২৩]

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় আমরা, মাত্রাতিরিক্ত রোমান্টিকতা – যা এক ধরনের ভাব বিলাসিতা তারই বিভিন্ন উদাহরণগুলো পর্যবেক্ষণ করব। আর এ ধরনের চিন্তার ফলে মানুষের উপর যে বিপদ আসন্ন হয় তা আলোচনা করব এবং কিভাবে এ ব্যাধির চিকিৎসা করা যেতে পারে তাও ব্যাখ্যা করব।

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ

যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অজ্ঞতা যুগের জেদ পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ নিজের তরফ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাঁদেরকে তাক্ওয়ার কথার উপর সুদৃঢ় রাখলেন, আর তাঁরা ছিল এর অধিক হকদার ও যোগ্য। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

[কোরআন : ৪৮ : ১৬]

সাধারণতঃ রোমান্স (দুঃসাহসিক অভিযান, অসাধারণ প্রেমের গল্প) কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক আন্দোলনকেই রোমান্টিকতা (Romanticism) বলে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এর (রোমান্টিকতার) এ দুটো ধরন ছাড়াও রোমান্টিকতা নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক সেন্টিমেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এদের মধ্যে প্রধান হল "রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ"– যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশ্বে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রথমে, এটা অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের সমালোচনা স্বতন্ত্রভাবে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং "রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের" বিরুদ্ধে। এ দুটোর মাঝে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

অতিমাত্রায় গোড়া ক্রোধ (Fanatical Rage)

জাতীয়তাবাদ বা দেশাত্মবোধ (Nationalism) শব্দটি সবচেয়ে সাধারণ অর্থে নিজের দেশ ও জনগণের প্রতি কোন ব্যক্তির ভালবাসাকে বুঝিয়ে থাকে। এটা একটি ভাল ও সম্পূর্ণরূপে বৈধ একটি সেন্টিমেন্ট বা হৃদয়ানুভূতি। দেশাত্মবোধ বিষয়টি ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করে না বলে মানবজাতির উপর এর কোন ক্ষতিকর প্রভাবও থাকে না। ঠিক যেমন নিজের মা কিংবা বাবার প্রতি কারো ভালবাসা একটি বৈধ অনুভূতি। তেমনি যে দেশ তাকে একটি সাধারণ বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে লালন করেছে, সেই দেশের প্রতি তার ভালবাসাও এটি বৈধ হৃদয়াবেগ।

জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্ট যখন অযৌক্তিক কিংবা অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবাবেগপূর্ণ হয় তখন তা অবৈধ হয়ে যায়। নিজ দেশের প্রতি ভালাবাসার খাতিরে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার যুক্তি ছাড়াই অন্য জাতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে কিংবা নিজ স্বার্থে অন্য দেশ ও জাতির অধিকারকে পদদলিত করে – উদাহরণস্বরূপ, তাদের ভূমি দখল করে কিংবা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াকত করে – তবে সে তার বৈধ সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিংবা যখন তার নিজ জাতির প্রতি ভালবাসাকে সাম্প্রদায়িকতার রূপ দেয় অর্থাৎ যখন সে দাবি করে যে, তার নিজ জাতি অপরাপর জাতির চেয়ে সহজাতভাবেই শ্রেষ্ঠ, তখন সে অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই অযৌক্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোয় যা **"অতিমাত্রার গোঁড়া ক্রোধ"** বলে বর্ণিত হয়েছে, তা ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজগুলোরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

> **"যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অজ্ঞতা যুগের জেদ পোষণ করছিল তখন আল্লাহ নিজের তরফ থেকে তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর নাযিল করলেন প্রশান্তি এবং তাঁদেরকে তাকওয়ার উপর সুদৃঢ় রাখলেন, আর তাঁরা ছিল এর অধিক হকদার ও যোগ্য। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"**
>
> [কোরআন : ৪৮ : ২৬]

উপরের আয়াতটি মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়া ক্রোধের কথা বলতে গিয়ে এক ধরনের প্রশান্তির কথাও বলে – যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশ্বাসী মুমিন বান্দাগণের প্রতি দান করেন। এই সন্নিধি বা পাশাপাশি স্থাপন (Juxtaposition) সেই সত্যটিকেই নির্দেশ করে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার জাতি, গোত্র কিংবা সম্প্রদায়কে ভালবাসে, আর সেই ভালবাসার কারণে অন্যদের প্রতি ঘৃণা বা আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করে তখন তার এই আচরণটি হবে ভ্রান্ত। বিপরীতক্রমে, আল্লাহ কামনা করেন যেন তাঁর বান্দাগণ শান্তি, প্রশান্তি আর নিরাপত্তা উপভোগ করে ; অন্য কথায়, আল্লাহ তাঁর অনুসারীগণের জন্য যে আত্মিক অবস্থাটি কামনা করেন তাহল সেই অবস্থা যেখানে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি থাকবে সর্বাগ্রে।

"ফানাটিক (অতিমাত্রায় গোঁড়া) ক্রোধ" সেই আকাংখিত পরিবেশ বিরাজ করতে দেয় না, বরং, কেবলমাত্র ভাষা, বর্ণ, গোত্র কিংবা বংশের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই একদলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

১৪০০ বছর আগেই আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এই গোঁড়ামিজাত ক্রোধের কথা উল্লেখ করেছেন, আর এই পৃথিবীর প্রতিটি অংশে এর প্রভাব আজও দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকায় এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্য লোকদের কেবলমাত্র ভিন্ন গোত্রের লোক বলে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। ইউরোপে একটি ফুটবল ম্যাচ সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হয় তখন, যখন মাস্তান বা গুণ্ডারা প্রতিদ্বন্দ্বী অপর দলের খেলোয়াড়দের পিটিয়ে প্রায় মৃতবৎ করে ফেলে। এর একটিই কারণ যে, তারা অন্য টীমের খেলোয়াড়। পশ্চিমা জগতে এমন সব সংস্থা রয়েছে যাদের একমাত্র কাজই হল, আফ্রিকান, ইহুদী, তুর্কী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। এমনকি সেই ঘৃণা এমন

মাত্রায় পৌঁছে যে, তারা এ সকল লোকদের (সংখ্যাগরু) সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

"অন্ধ গোড়ামিজাত ক্রোধ" শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর লোকের মাঝেই নয়, বরং সবচেয়ে উঁচুতলার ক্ষমতাশীল বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মাঝেও বিরাজ করে। অনেক দেশ রয়েছে যারা সামান্য সীমান্ত বিতর্কের বিষয়টিকেও নগ্ন হামলার ওজর হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ গ্রহণ করে। নিজেদের যুদ্ধবাজ মনোভাবকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে তারা তাদের দেশকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। আর বছরের পর বছর ধরে একগুয়েমি মনোভাবে নিয়ে তাদের অগ্রাসন চালিয়ে নিয়ে যায়; আর এতে কেবল তাদের শত্রু দেশের জনগণকেই নয়, নিজেদের জনসাধারণকেও দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত করে। এ যে কর্তৃপক্ষরা এমন সিদ্ধান্ত নেয় তারা আসলে আমাদের উল্লিখিত "অন্ধ গোড়ামিজাত ক্রোধ" – এ পীড়িত লোক। উপরে উক্ত আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যারা তাদের অন্তর "অন্ধ গোড়ামিজাত ক্রোধে" পূর্ণ রাখে তারা অজ্ঞতার মাঝে বাস করে।

এরূপ অজ্ঞানীদের মাঝে তারাও রয়েছে যারা বিংশ শতাব্দীর দু'টি বৃহত্তম বিপর্যয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উস্কানি দিয়েছিল। "জার্মান বীরত্ব" ইংরেজ গৌরব" আর "রাশিয়ান সাহস" – এই মিথ্যা ধারণাগুলো দ্বারা আলোড়িত হয়ে তারা কেবল নিজেদের দেশই নয় বরং গোটা পৃথিবীকেও মহা দুর্ভোগের বস্তুতে পরিণত করেছিল। এ দু'টি যুদ্ধে ৬৫ মিলিয়ন মানুষের রক্ত ঝরে যায়, ১০ মিলিয়ন মানুষ পঙ্গু, বিধবা ও এতিম হিসেবে রয়ে যায়।

এসব বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল "অন্ধ গোড়ামিজাত ক্রোধোন্মত্ততা"। আমরা এখন একে "রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ" হিসেবে উল্লেখ করছি।

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের জন্ম

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ একটি ধারণা হিসেবে ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার আগে জনসাধারণ বহু সামন্ত প্রভুর ক্ষমতার অধীনে

বসবাস করত। এরপর তারা সবাই একত্রে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন দ্বারা শাসিত একটি এক জাতি-রাষ্ট্রের অধীনে আসে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড - এ দু'টি ইউরোপীয় দেশ সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের ধারণাটি সমর্থন করে এবং সর্বপ্রথম এক জাতি-রাষ্ট্রে রূপ নেয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের বেশির ভাগ জাতি জাতীয় ঐক্য অর্জন করে।

কেবলমাত্র দু'টি রাষ্ট্র এই উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেনি, তারা হল জার্মান ও ইতালি। এই দু'টি রাষ্ট্রেরই ক্ষুদ্ররাজ্যের কিংবা নগর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দীর্ঘ সময় টিকেছিল। কেবল ১৮৭০ সালে ইতালি জাতিসত্তা লাভ করে, আর জার্মানী তা অর্জন করে আরো বছরখানেক পরে ১৮৭১ সালে। অন্যকথায়, জাতীয়তাবাদের ধারণা গ্রহণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ দুটি দেশই অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে পিছনে পড়েছিল।

যাই হোক, এই বিশেষ অবস্থাটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এই দু'টি দেশে অধিকতর মৌলিক ব্রান্ডের জাতীয়তাবাদের বিকাশের কারণ ছিল। সমাজ বিজ্ঞানীদের ব্যাপক বিস্তৃত মতানুসারে, এই দুই দেশে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ নামক দু'টি চরম প্রকৃতির জাতীয়তাবাদের জন্ম ও ক্ষমতায়নের কারণ হল, বিলম্বে গঠিত জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে সংযুক্ত অন্ধ গোঁড়ামিজাত জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্টের প্রসার।

এ দুটি দেশে, বিশেষভাবে জার্মানে, যারা গোঁড়া জাতীয়তাবাদের ধারণাটির অগ্রগতি সাধন করেছিল তারা "রোমান্টিক জাতীয়তাবাদী" নামে পরিচিত ছিল। যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো হল – যুক্তির জন্য ক্ষতিকর – এমন এক অনুভূতির উচ্চ প্রশংসা করা, তাদের এ বিশ্বাস যে, তাদের জাতি অতিন্দ্রীয় ও রহস্যময় "শক্তি" দ্বারা ভূষিত, আর তাদের এই শক্তিই তাদেরকে অন্যান্য জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বানিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তা পৃথিবীর সর্বত্র গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে আর তা মানুষকে এ দাবির দিকে পরিচালিত করছিল যে ইউরোপের সম্প্রদায়গুলো পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর উপর শ্রেষ্ঠ আর তাই অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোকে শাসন করার অধিকার তাদেরই রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বিশেষ করে জার্মানে, আবার রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লেখক পল লেগ্রেড আর জুলিয়াস ল্যাংগবেহন এক ধরনের উত্তরাধিকারসূত্রের বিশ্বনীতির ধারণার সমর্থন করেছিল – যা কিনা শাসনের যোগ্যতা রাখে কেবল জার্মানীরা।

বিংশ শতাব্দীতে "রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের" মারাত্মক উদাহরণ ছিল হিটলারের জার্মানী। সম্পূর্ণ রোমান্টিক আদর্শবাদ প্রভাবের ভিতর দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, আর এটা যে নিপীড়ন ও দুর্ভোগের জন্ম দিয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কালিমা লেপন করে

তারা দাবি করে যে, "জার্মান স্পিরিট" আর "জার্মান রক্তের" স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই এই উত্তরাধিকারসূত্রের বিশ্ব-বিন্যাসটি অর্জন করা যাবে, আর এর শেষে, অবশ্যই খ্রিস্টান ধর্মের মত একেশ্বরবাদী ধর্মের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে অতীতের পৌত্তলিকতার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত হবে জার্মানীদের।

সেই কারণেই জার্মানে অতীন্দ্রিয় (গুপ্ত) সমাজের উদ্ভব রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সমাজগুলোর মাঝে ভাগ করে নেয়া বিশ্ব মতামতটি বিভিন্ন ধরনের অসার ধারণা নিয়ে গঠিত ছিল। ধারণাগুলো হল ঃ মানুষ তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে নয় বরং তার অনুভূতি ও অন্তর্জ্ঞান দিয়ে সত্যকে অর্জন করতে পারে ; প্রতিটি দেশেরই একটি জাতীয় "স্পিরিট" রয়েছে, জার্মানীদের জাতীয় "স্পিরিট"

হল একটি পৌত্তলিক স্পিরিট। এই সমাজগুলোই হিটলার ও ন্যাৎসীবাদের উত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছিল। ইংরেজ ইতিহাসবিদ মাইকেল হাওয়ার্ড লিখেন যে, "সর্ব জার্মান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থান যা গুপ্তবাদ হতে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আর গুপ্ত সমাজগুলোর দুর্বোধ্য দর্শন থেকে এর আদর্শবাদ গ্রহণ করেছিল ---------- গঠন করেছিল ---------- চরম সাম্প্রদায়িক নীতিমালা, যা ১৯২০ এর দশকে জাতীয় সমাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল।"

প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের অন্যতম নিষ্ঠুর ও রক্তাক্ত শাসন ব্যবস্থা নাৎসীবাদের ভিত্তি তৈরি করে দেয়াই ছিল মানবজাতির প্রতি রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের একমাত্র অবদান।

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের সিজোফ্রেনিয়া

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করত যে তারা বিচারবুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভূতি ও অন্তর্জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সত্যকে খুঁজে পাবে – এ কারণে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বিশৃংখল অভিমত গ্রহণ করে নিয়েছিল যা কিনা তাদের অপ্রতুল আত্মিক অবস্থাটির প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। আমেরিকার ইতিহাসের অধ্যাপক গারহার্ড রেম্পেল "প্রোশিয়ায় সংস্কার, মুক্তি ও রোমান্টিকতা" নামক রচনায় নিম্নলিখিত ভাষায় রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীদের আত্মিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

> কল্পনাবিলাসী ব্যক্তিরা (Romanticists) অলীক কল্পনা, ভাববিলাসিতা আর প্রতিকাশ্রয়ী কাহিনীর মাঝে হারিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বেড়াত। আত্মিকভাবে তারা মৃত্যু, বিষণ্নতা, রাত্রির গুরুগম্ভীর, অস্বচ্ছ অবকাশ ইত্যাদি নিয়ে গভীরভাবে ভাবত না। অতীত জার্মান রোমান্টিকদের অগ্রদূত, নোভালিস বলেছেন ঃ "আত্মার একটি ব্যাধিই হল জীবন।" এখানে আমাদের যা রয়েছে তা নান্দনিক নৈরাশ্যবাদের গুরু ----- রোমান্টিকতা মানবাত্মার গভীরতর বিচারবুদ্ধিহীন শক্তিটি প্রকাশ করে দিয়েছিল ---------- নোভালিস বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত বিশ্ব ও যুগসমূহ কল্পনার যাদু দিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে -------- মুক্তিযুদ্ধের দেশপ্রেমমূলক সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এই "আত্মার নৃত্য" জনসাধারণের ব্যাপক অংশে পৌঁছে গিয়েছিল। জার্মান কল্পনাবিলাসী ব্যক্তিগণ নন্দন তত্ত্ববাদের জনপ্রিয় ফ্যাশনের জন্ম দিয়েছিল যা ছিল বিচারবুদ্ধি বা যুক্তির তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান আর একটি তাৎক্ষণিক মুহূর্তে

একতা ও সদ্যস্কতা (immediacy) কে বুঝতে পারার একটি প্রচেষ্টা। এই কাব্য সংক্রান্ত মতাবাদটিই ছিল পরিপূর্ণরূপে বাস্তব। [২]

"আবেগের" উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ। এই খেয়ালী আদর্শবাদটি বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্ম দিয়েছিল, যারা নিজেদের মানসিক বিভ্রান্তিতে হারিয়ে যেত। রোমান্টিকতাবাদ মানুষকে নিজেদের অনুভূতির দাসে পরিণত করেছিল, তাদেরকে বাস্তবতা থেকে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলতে প্ররোচিত করত আর

নাৎসীদের জার্মানীতে জনগণকে সাড়ম্বর আবেগ প্রবণতার প্রভাবাধীন করে আবেগাপ্লুত বা অভিভূত করে রাখা হত। আর তারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে নাৎসীবাদের অমানবিক আস্ফোলনকে বিনা বাধায় মেনে নিত

এভাবেই এটাকে সিজোফ্রেনিয়া রোগটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। (যারা সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগে তারা বাস্তব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের নিজেদের কল্পনাজাত একটি জগতে বাস করে।)

সিজোফ্রেনিয়া রোগটি রোমান্টিক জাতীয়তাবাদে আত্মিক অবস্থার একটি মর্মভেদী সাদৃশ্য সরবরাহ করে – যা কিনা কিছুসংখ্যক ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, যাদের মাঝে প্রধান হল "রক্ত" আর "পিতৃভূমির" ধারণা, যাকে তারপর দেবতায় রূপ দেয়া হয় আর অন্ধভাবে অনুসরণযোগ্য একটি আচ্ছন্নতায় রূপান্তরিত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে জার্মানীতে "Blut and Boden" (রক্ত আর পিতৃভূমি)- এই ধারণাটি গতি লাভ করে। এই ধারণা অনুযায়ী জার্মান রক্ত আর জার্মান পিতৃভূমিই হল পবিত্র, আর দেশটির অভ্যন্তরে যে সকল সংখ্যালঘু লোকেরা জার্মান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে ধারণা করা হতো যে তারা জার্মান

রক্তকে দূষিত করছে আর জার্মান পিতৃভূমিকে করছে কলংকিত। চিন্তার এই প্রবাহ নাৎসী ভাবাদর্শের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল যার ফলে রক্তপাত ঘটানোকে পবিত্র ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের একটি অংশ হিসেবে দেখানো হত। ১৯২৩ সনের একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর, হিটলার নাৎসী রক্তে রঞ্জিত একটি দলীয় পতাকা নিলেন আর কার্যতঃ একটি উপাসনার বস্তুতে ------ পরিণত করেন। পতাকাটি যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমনিভাবে তা সংরক্ষিত করা হয় আর সব নাৎসী সমাবেশে তা পবিত্রতম প্রতীকে পরিণত হয়। অন্যান্য নূতন পতাকাগুলোকে এর সঙ্গে ছোঁয়ানো হত যেন পতাকাটি নতুন পতাকাগুলোর মাঝে নিজের "পবিত্র গুণের" কিছুটা সঞ্চারিত করতে পারে।[৩]

উপরে ঃ নাৎসিযুগের একটি প্রচার পোস্টার যা রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের একটি প্রতীক হয়ে আছে, আর যা জার্মান সম্প্রদায় ও জনগণকে তীব্রতর আবেগপ্রবণতা দিয়ে উচ্চ প্রশংসিত করছে

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদে রক্তপাত

যে ধরনের মনোভাবই রক্ত আর রক্তপাতকে পবিত্র বলে গণ্য করে, সেগুলোই মানব ইতিহাসে রক্তাক্ত সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে দেখা গিয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীদের মাঝে সংঘাত বা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের প্রবাহ সবচেয়ে সুস্পষ্টরূপে দেখা গিয়েছিল জার্মানীতে, কিন্তু একই সময়ে ইংরেজ, ফরাসী ও রাশিয়ান সমাজগুলোতেও এর প্রভাব বিদ্যমান ছিল যেখানে ঐ দেশগুলোকেও যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসার ব্যাপারে এটি দায়ী ছিল। যে সমস্যাগুলো ভিন্নভাবে কূটনীতির মাধ্যমে সমাধান করা যেত, সে

সমস্যাগুলোর আগুনই রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের প্রভাবটি উস্কে দিয়েছিল আর পরিণতিতে, মিলিয়ন মিলিয়ন মানবজীবনের ধ্বংসলীলায় পৃথিবীকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল।

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের ফলাফল বুঝতে হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও বিকাশ খুঁতিয়ে দেখা দরকার। যদিও বহু দেশ যুদ্ধটিতে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক দেশই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। একপক্ষে ছিল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া, অন্যপক্ষে ছিল জার্মান ও অষ্ট্রো হাংগেরিয়ান সাম্রাজ্য। যুদ্ধটির সূচনায় সব সেনানায়কদেরই একটি সাধারণ সামরিক কৌশল ছিল, যেটি হল ঃ প্রবল

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকেই মানুষকে বিশ্বযুদ্ধের প্ররোচণা দেয়া হয়েছিল যার একমাত্র ফলাফল ছিল রক্তপাত, দুর্দশা আর চোখের জল। এ সমস্ত যুদ্ধের ফলস্বরূপ মিলিয়ন মিলিয়ন লোক নিহত, বিধবা, এতিম হয়ে যায় আর হাজার হাজার নগর হয় ধ্বংস

আক্রমণ চালিয়ে শত্রু লাইন বিভক্ত ও ছত্রভঙ্গ করে ফেলা যেতে পারে আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিজয় অর্জিত হবে। তবে সেই যুদ্ধ কোন বিজয় বয়ে নিয়ে আসেনি।

১৯১৪ সালে জার্মান আকস্মিকভাবে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে বসে। প্রাথমিক অগ্রগতির পর, সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, হামলার জন্য সম্মুখ সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন বছরেও কোন সাফল্য অর্জন করা যায়নি। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে বারংবার আক্রমণ করছিল প্রতিপক্ষের ফ্রন্টকে বিভক্ত করার আশায় কিন্তু পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়ে

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ হতে আবির্ভূত যুদ্ধগুলোতে মানব জীবনের মূল্য প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভুলে গিয়েছিল মানুষ। "জার্মান স্পিরিট", "ইংরেজ গৌরব" আর "ফরাসী বিক্রম"– এ ধরনের আবেগপ্রবণ ধারণাগুলোতে উত্তেজিত হয়ে আর সামরিক কুচকাওয়াজের গানে ও কবিতায় প্রশংসিত হয়ে নেতারা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের নিজেদের জনগণকে হানাহানির দিকে ঠেলে দেয়

গেল। বিখ্যাত ভার্দুনের যুদ্ধে যার সূচনা হয়েছিল জার্মানীদের আক্রমণের মধ্য দিয়ে, তাতে সর্বমোট ৩,১৫,০০০ ফরাসী ও ২,৮০,০০০ জার্মান সৈন্য নিহত হয়, কিন্তু ফ্রন্ট মাত্র কয়েক কিলোমিটার পিছনে সরেছিল। মাস কয়েক পর, ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যরা সোমের যুদ্ধে একটি পাল্টা আক্রমণ চালায়, যার ফলে রক্তযুদ্ধে ৬,০০,০০০ জার্মান ৪,০০,০০০ এর বেশি ইংরেজ এবং প্রায় ২,০০,০০০ ফরাসী সৈন্য প্রাণ হারায়। তথাপি জার্মান ফ্রন্টকে কেবলমাত্র ১১ কিলোমিটার পেছনে হটানো গিয়েছিল। রোমান্টিক কুচকাওয়াজ সঙ্গীতে জ্বলে উঠা উদ্দীপনা, আর "জার্মান স্পিরিট" "ইংলিশ গৌরব", 'ফরাসী বিক্রম"– এর প্রশংসা গাঁথা আন্দোলিত করা কবিতার মাধ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে রণকৌশল বিশারদগণ আর ব্যূহ পণ্ডিতগণ (Tacticians) অনভিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যার ফলে তাদের নিজেদের জনগণকেই বলি দিতে হয়েছিল। যুদ্ধের সময় সাড়ে তিন বছর কাদার পরিখায় কাটিয়ে যে সৈন্যরা বেঁচে গিয়েছিল, যারা অবিরাম বোমা বর্ষণের ফলে এমনকি তাদের মাথা পর্যন্ত উঠাতে পারত না ; তাদের বেশির ভাগই তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মানসিকভাবেও দুর্ভোগ পোহাচ্ছিল।

১৯১৭ সালে এপ্রিলে ফরাসী জেনারেল রবার্ট নিভেলির নেতৃত্বে জার্মান সেনাদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ চালানো হয়। রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে নৃশংস রক্তপাত ঘটিয়েছিল, এই আক্রমণটিই তার একটি ভয়ানক উদাহরণ। যুদ্ধের পূর্বে নিভেলি এ বলে অঙ্গীকার করেছিল যে

"দুদিনের মধ্যেই সে জার্মান লাইন বিভক্ত করবে আর এক সপ্তাহের মাঝেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে।"

যদিও "জার্মান সৈন্যরা" অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল, তবু শুধুমাত্র এই অযৌক্তিক অঙ্গীকারকে সম্মান দিতে গিয়ে ফরাসীর সৈন্যবাহিনী ১৬ এপ্রিল আক্রমণ করে বসে। যে আক্রমণটি দুদিনে শেষ হবে বলে তারা আশা করেছিল, তা কোন ফলাফল ছাড়া দেড় মাস স্থায়ী হল, শত সহস্র সৈন্যের মৃত্যু ছাড়াও অবশেষে ফরাসী সৈন্যদের মাঝেই বিদ্রোহ দেখা দিল।

রক্তলালসার একই মানসিকতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আবার সম্মুখে হাজির হতে দেখা গেল, তবে এবার এল তার চেয়ে বেশি হতাহতসহ। হিটলার, মুসোলিনি আর স্টালিনের ন্যায় চিত্তবিকারগ্রস্ত রোমান্টিকদের দাম্ভিক উচ্চাকাংখার ফলস্বরূপ ৫৫ মিলিয়ন মানুষ প্রাণ হারাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রক্ত লালসার একটি মানসিকতা জন্ম নেয়। হিটলার, মুসোলিনী, আর স্টালিনের ন্যায় রোমান্টিকদের চিত্ত বিকারগ্রস্ত আবেগের ফলস্বরূপ সর্বমোট ৫৫ মিলিয়ন লোক ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুর নায়কদের কাহিনী যাদের আকাশ-কুসুম আদর্শ সন্ধানের কারণে সারা পৃথিবীতে অত্যাচার, নির্মমতা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে গিয়েছিল

রোমান্টিকতা যে শুধু আন্তর্জাতিক সংঘাতেই ভূমিকা রাখে তা নয়, বরং বিভিন্ন দেশ, গোত্র আর সংস্থাসমূহের মাঝে বিদ্যমান যুদ্ধ ও আগ্রাসনের মূলেই রয়েছে এটির অবস্থান। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের বাসস্থানের বাস পরিস্থিতির উপাদানগুলো সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা না রেখেই আবেগময় শ্লোগান, বীরত্ব কাহিনী, আন্দোলিত করা কুচকাওয়াজ সঙ্গীত আর কবিতায় প্রভাবিত হয়ে অস্ত্র তুলে নেয় ; আর শুধু নিজেদেরই নয় বরং যাদের তারা শত্রুজ্ঞান করে তাদেরও রক্ত ঝরায় আর এভাবে সমস্ত পৃথিবীকে ভুল বুঝাবুঝি ও সংঘাতে নিমজ্জিত রাখে।

পৃথিবীর চার কোণে, রোমান্টিকতা দিয়ে মানুষ নিষ্ঠুরতা ও বর্বর কাজে প্ররোচিত হয়ে অন্যদের অকল্পনীয় অত্যাচারের শিকারে পরিণত করতে পারে, আর তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অমানবিক কাজ করতে পারে

এই বইটির প্রারম্ভে আমরা দেখেছিলাম যে, মানবজাতিকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে আর তাদের দুর্দশায় চালিত করতে শয়তান ভাবাবেগকে (Sentimentality) একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। মানবজাতির জন্য শয়তান যে ফাঁদ পেতে রেখেছে, তার প্রমাণ পরিষ্কারভাবে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের মাঝে দেখা যায়। শয়তান কিভাবে তার প্রভাবাধীন মানুষকে ভয়, সংঘাত ও শত্রুতায় নিপতিত করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ

> "যাও, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিফলপূর্ণ শাস্তি। তাদের মধ্যে যাদের পার তোমার আহ্বানে পদস্খলিত কর, তোমরা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তানতো তাদেরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে। [কোরআন : ১৭ : ৬৩-৬৪]

উপরের আয়াতসমূহ বর্ণনা করছে যে, কিভাবে শয়তান তার নিয়ন্ত্রণাধীন লোকদের ব্যবহার করে, তার গলার স্বর দ্বারা যাদের পারে তাদের প্ররোচিত করে" আর "তার অশ্বারোহী সেনাদল আর পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সমবেত করবে"–এগুলো রোমান্টিক জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়ার উপায়াবলী।

ডারউইনবাদ : রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ তাদের রক্তপাতের ঝোঁকটিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপাদন করার সাহায্যার্থে কিছু দার্শনিক ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিস্ময়কর প্রকাশসমূহের আশ্রয় নিয়েছে। এই বিস্ময়কর প্রকাশসমূহের ভিত্তি হল ডারউইনের বিবর্তন থিওরীটি।

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডারউইন "প্রজাতির উৎপত্তি" (The Origin of Species) নামে একখানা বই লিখেন যা ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে তিনি প্রস্তাবনা পেশ করেন যে, প্রকৃতিতে একটি নিষ্ঠুর সংগ্রাম সংঘটিত হয় আর এই সংগ্রামে কে সুবিধাদি অর্জন করবে কি করবে না এর উপরই নির্ভর করে জীবিত বস্তু বিকশিত হয় আর নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। অন্যকথায় ডারউইনের মতে, সংঘাত বা বিরোধই হল প্রকৃতিতে বিকাশের চাবিকাঠি। ১৮৭১ সনের প্রকাশিত "মানুষের উদ্ভব" (The Descent of Man) নামক আরেকখানা বইয়ে ডারউইন আরো দৃঢ়তার সঙ্গে তার ধারণাগুলোর উন্নয়ন ঘটান, আর অধিকন্তু প্রস্তাব করেন যে, মানবজাতির মাঝে কোন কোন সম্প্রদায় অন্য সম্পদায়ের তুলনায় অধিকতর উন্নত, আর এভাবেই তিনি বৈজ্ঞানিক সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি স্থাপন করেন। ডারউইন ইউরোপের সাদা সম্প্রদায়কে "উন্নত সম্প্রদায়" আর আফ্রিকান, এশিয়ান এমনকি তুর্কীদেরও "আদিম আর অর্ধ-বানর" বলে বিবেচনা করেন।

ডারউইনের মতবাদটি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা আর রণমুখীতা এতদূর পর্যন্ত সমর্থন লাভ করে যে এগুলোকে "বৈজ্ঞানিক সত্য" (Scientific fact) বলে উপলব্ধি করা শুরু হয়ে যায়।

ডারউইনবাদের সঙ্গে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের সম্পর্কটি এভাবে স্পষ্ট হওয়া উচিত ঃ ডারউইনবাদের উপর ভিত্তি করেই রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীরা তাদের যুদ্ধ লালসা আর অন্য সম্প্রদায়ের উপর নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের

বদ্ধমূল ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে অসাধারণ পরিমাণে রক্তপাত সংঘটিত হয়েছিল তাতে যে ডারউইনবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব কাজ করেছিল তা চিহ্নিত করা সম্ভব। এক মুহূর্তও দ্বিধাবোধ না করেই জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, রাশিয়ান আর অষ্ট্রিয়ান জেনারেলরা শত সহস্র সৈন্যদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। "জীব সংঘাতের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয় আর জাতিসমূহ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে উৎকর্ষতায় উপনীত হয়"– ডারউইনের এই শ্লোগানের উপর তারা অবিচলিত রইল। এ ধারার চিন্তা অনুসারেই তারা যুদ্ধের আদেশ দিয়েছিল।

চার্লস ডারউইনের থিওরীটি পৃথিবীতে দুঃখের উপর দুঃখ নিয়ে এসেছিল

উদাহরণস্বরূপ, ফ্রেডরিক ভন বার্নহার্ডি নামক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন জেনারেল কর্তৃক যুদ্ধ আর প্রাকৃতিক সংঘাতের নীতিমালার মধ্যবর্তী যোগাযোগটি তুলে ধরা হয়। বার্নহার্ডি ঘোষণা করলেন, "যুদ্ধ একটি জীবতাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা'; প্রকৃতির মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যবর্তী সংগ্রামের মতই এটা প্রয়োজনীয়।"

"এটা জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে। কারণ, এর সিদ্ধান্তগুলো একেবারে বস্তুর স্বভাবের উপরই নির্ভরশীল।"[৪]

অস্ট্রো হাংগেরিয়ান সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি, জেনারেল ফ্রাঞ্জও বেরন ভন হোয়েটযেন ড্রফ যুদ্ধের পর তার স্মৃতিতে লিখেন ঃ

জনহিতকর কর্ম, নৈতিক শিক্ষা আর দার্শনিক মতবাদগুলো সবচেয়ে অপরিবর্তিতভাবে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মানবজাতির সংগ্রামকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করে দিতে কখনও কখনও ভূমিকা রাখতে পারে কিন্তু সেগুলো কখনও একে (সংগ্রাম) পৃথিবীর একটি ধাবমান চালক হিসেবে সরিয়ে দিতে সফল হবে না ----- এটা এই বৃহৎ নীতি অনুসারেই যে, রাষ্ট্র

ও জনগণের জীবনে চালিকা শক্তির ফলস্বরূপই বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় নেমে এসেছিল, এটা নেমে এসেছিল একটি বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়বৃষ্টি রূপে, যেটি স্বভাবগতভাবে নিজেই নিজেকে বর্ষণ করবে।"

জার্মান চ্যান্সেলর থিওবাল্ড ভন বেথম্যান হলভয়েজ – এর উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুর্ট রেইজলার ১৯১৪ সালে লিখেন ঃ

> চিরন্তন ও চরম শত্রুতা মানুষের পাস্পরিক সম্পর্কের মাঝে মৌলিকভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে ; আর সর্বত্র আমরা যে শত্রুভাব প্রত্যক্ষ করি--- তা মনুষ্য স্বভাবের বিকৃতির ফলস্বরূপ ঘটে না, বরং, এটাই জগতের মৌলিক স্বভাব আর এটা নিজেই জীবনের উৎস।[৬]

ডারউইনের সময়কাল থেকেই বর্ণবাদ আক্রমণ ও তদসম্পর্কিত নৃশংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আজও আমরা এমন অস্বাভাবিক প্রবণতা বিরাজ করতে দেখি। যেমন নিউ-নাৎসী ও Ku Klux Klan সংগঠনগুলো কালো আর ভিন্ন বর্ণের মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়ে থাকে। ভুলে যাওয়া অবশ্যই উচিত হবেনা যে এসব অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিগুলোর সর্বপ্রথম ও আদি উৎপত্তির দায়-দায়িত্ব সামাজিক ডারউইনবাদেরই বহন করতে হবে

রোমান্টিকতা একই পদমর্যাদাসম্পন্ন কিংবা সমান স্তরের মানুষের মাঝে আবেগপ্রবণ সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে, কিন্তু ভিন্ন পদমর্যাদা বা স্তরের মানুষের বিরুদ্ধে তা রাগ ও ঘৃণার প্ররোচনা দিয়ে থাকে। এটি "টিকে থাকার জন্য সম্প্রদায়গুলোর সংগ্রাম"– ডারউইনের এ ধারণার সঙ্গে সবচাইতে সঙ্গতিপূর্ণ একটি স্পিরিট বা মর্মকথা। সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগের বেলায় ডারউইনের মতবাদের নাম দেয়া হয়েছে, "সামাজিক ডারউইনবাদ," আর এটাই রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ আর সাম্প্রদায়িকতাকে যুক্তিযুক্ত করার প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। "পরিবেশ বিজ্ঞান আর অতি দক্ষিণপন্থী জার্মানীদের মাঝে ফ্যাসীবাদের আধুনিকীকরণ – এ নামের প্রবন্ধে আমেরিকান লেখক জেনেট বিল এ বিষয়টির উপর লিখেন ঃ

> অতি দক্ষিণপন্থী জার্মানদের মাঝে সামাজিক ডারউইনবাদের গভীর শিকড় রয়েছে। এঙ্গলো আমেরিকান সামাজিক ডারউইনবাদের মত, জার্মান সামাজিক ডারউইনবাদ মানববিহীন পৃথিবীতে "প্রাকৃতিক আইন" হিসেবে মানবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রক্ষেপ করেছিল, তারপর মানুষের সামাজিক বিন্যাসকে "স্বাভাবিক" বলে সিদ্ধ করার নিমিত্ত এই "আইনগুলোর" সাহায্য নিয়েছিল। এটা "যোগ্যতমের টিকে থাকা"– এই বাণীটিও সমাজে প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু যেখানে এঙ্গলো-আমেরিকান ডারউইনবাদীরা "রক্তাক্ত দাঁত ও তীক্ষ্ণ নখরে" পূর্ণ পুঁজিবাদী জঙ্গলের উদ্যোক্তা ব্যক্তিদেরকে "যোগ্যতম" বলে ধারণা করত সেখানে জার্মান সামাজিক ডারউইনবাদ যোগ্যতমকে "সম্প্রদায়ের" বেশে ব্যাপকভাবে ধারণা করত। এভাবে যোগ্যতম সম্প্রদায় যে কেবল টিকে থাকবে তাই নয়, তাদের টিকে থাকাই উচিত, "অস্তিত্বের সংগ্রামে" তার সকল প্রতিযোগীদের পরাভূত করে তাদের টিকে থাকা উচিত।[৭]

আর্ণস্ট হেকল : জার্মানীতে সামাজিক ডারউইনবাদের প্রধান প্রস্তাবক

জার্মানীতে জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকল ছিলেন সামাজিক ডারউইনবাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। (১৮৩৪-১৯১৯) তার মতবাদের প্রস্তাবের জন্য ডারউইনবাদের প্রতি তার অবদান রয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের বিকাশ পর্যায়ে বিবর্তন প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তার এই থিওরীর সংক্ষিপ্তসার হল "ব্যক্তির ক্রমবিকাশে সমষ্টির ক্রমবিকাশের পুনরাবৃত্তি ঘটে।"

বছরখানেক পর জানা গেল যে, তার মতবাদ ছিল ভিত্তিহীন আর এমনকি হ্যাকল তার চার্ট ও চিত্রগুলোকে জাল করেছেন।

হ্যাকল "মনিস্ট লীগ" নামক একটি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে সংগঠনের লক্ষ্য ছিল নাস্তিকতার বিস্তার, আর একই সময়ে যা সাম্প্রদায়িকতা ও রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯২০-এর দশকে হিটলারের নেতৃত্বাধীনে ক্রমে গড়ে উঠা নাৎসী আন্দোলন, মনিস্ট লীগ আর হেকলের ধারণা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল। ইতিহাসবিদ ডেনিয়েল গ্যাসম্যান এই বিকাশগুলো সম্পর্কে "জাতীয় সমাজ বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উৎস ঃ আর্নস্ট হ্যাকল ও জার্মান মনিস্ট লীগে ডারউইনবাদ" নামক প্রবন্ধে বলেন ঃ

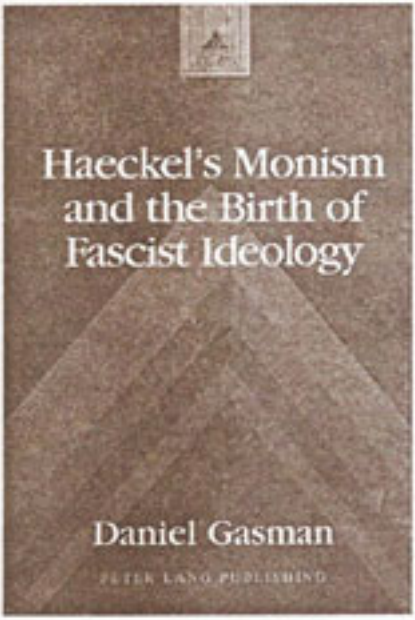

উপরে দেখা যাচ্ছে, গ্যাসম্যানের আরেকখানা বই, যা জার্মানীতে সামাজিক ডারউইনবাদের উৎপত্তিকে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিল

> জার্মানীতে সাম্প্রদায়িকতা থেকে উৎসাহিত ডারউইনবাদ-এর সৃষ্টির জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই হ্যাকলের কাছে ঋণী। ---------- তার ধারণাগুলো সাম্প্রদায়িকতা,------ সাম্রাজ্যবাদ, রোমান্টিকতা, ইহুদী বিদ্বেষবাদ আর জাতীয়তাবাদ - এই প্রবণতাগুলোকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ দেহবিশিষ্ট আদর্শবাদের জন্ম দেয় -------- ভলকসম্যানের অপরিহার্যরূপে ও গূঢ়তাত্ত্বিক ধারণাসমূহের পাশাপাশি বিজ্ঞানের পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে এসেছিলেন।[৮]

গ্যাসম্যান আরো লিখেন ঃ

> এটা বলা যেতে পারে যে, ইংল্যান্ডে ডারউইনবাদ ছিল Laissez Faire ব্যক্তিবাদের সম্প্রসারণ যা সামাজিক জগত থেকে প্রাকৃতিকভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল (জার্মানীতে তা ছিল) জার্মান রোমান্টিকতা ও দার্শনিক আদর্শবাদের প্রক্ষেপণ ---------- জার্মানীতে সামাজিক ডারউইনবাদ যে ধরনটি গ্রহণ করেছিল তা ছিল প্রকৃতি উপাসনার মিথ্যা 'অপ্রকৃত বৈজ্ঞানিক ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ধারণার সংমিশ্রণে যুক্ত প্রাকৃতিক মরমীবাদ।[৯]

একই ধারায় জেনেট বিয়েল লিখেন যে, "হ্যাকলও গুঢ়তাত্ত্বিক সাম্প্রদায়িকতা (Mystical Racism) ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, সেজন্য জার্মান সামাজিক ডারউইনবাদ শুরু থেকে ছিল একটি রাজনৈতিক ধারণা - যা রোমান্টিক সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদকে একটি মিথ্যা জীববিজ্ঞান বিষয়ক ভিত্তি দিয়েছিল।"[১০]

উপসংহার

আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা আরও একবার প্রতিপাদন করছে যে, রোমান্টিকতা সম্পূর্ণরূপে ধর্মের সীমার বাইরে আর ধর্মের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও একটি বিশ্বমত। এই অর্থে এটাও স্পষ্ট যে, ডারউইনবাদ-যা-কিনা এর প্রথম প্রস্তাবনার শুরু থেকেই নাস্তিকতার প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে তা (ডারউইনবাদ) আসলে রোমান্টিকতার মাঝেই নিহিত রয়েছে।

ডারউইনবাদের সঙ্গে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক আর নাৎসী আন্দোলনে এর ভূমিকাটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে ঃ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতিই রোমান্টিকতা একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে কাজ করে। যারা এর মাঝে (রোমান্টিকতার মাঝে) আবদ্ধ হয়ে আছে তারা যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান ও সঠিক বিবেকের সম্পূর্ণ বিরোধী এক চিন্তাধারার মাধ্যমে সহজেই প্রতারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ তাদের মাঝে বিশ্বাস জন্মানো যেতে পারে যে, তাদের নিজেদের সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর চেয়ে উৎকৃষ্ট, যুদ্ধে গিয়ে, হামলা করে পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশ নিজেদের দখলে নিয়ে আসাটা তাদের জন্য ন্যায্য আর অন্যান্য জাতিকে ধ্বংস করা কিংবা নিজেদের দাসে পরিণত করাটা তাদের জন্য একটি বৈধ কাজ।

নাৎসী জার্মান হল অতীত ঐতিহাসিক উদাহরণ যা রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দেয়। ১৯৩৩ সনে যখন নাৎসীরা ক্ষমতায় আসে তখন হিটলার এবং তার জেনারেল স্টাফগণ "রোমান্টিক সেন্টিমেন্ট হৃদয়ে গ্রথিত করার জন্য" অভিযান শুরু করে আর স্বল্প সময়ের মাঝে জার্মান সমাজ রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের অর্থহীন দাবিগুলো গ্রহণ করে নেয়। ১৯৩০ সনের শেষ দশকে, আশ্চর্যজনকভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ জার্মানীরা বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, শীঘ্রই একটি "জার্মান সাম্রাজ্য" (Third Reich) প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যা গোটা বিশ্ব শাসন করবে এবং সহস্র বছরকাল স্থায়ী হবে সে সাম্রাজ্য। তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে, তাদের প্রতীক্ষিত এ ভাগ্য নিয়ে আসার জন্য দেশের সকল সংখ্যালঘুদের বের করে দিয়ে জার্মান সম্প্রদায়ের "বিশুদ্ধ" হওয়া দরকার। তারা আরো বিশ্বাস করত যে অনাক্রমণীয় ও অজেয় আর অতি প্রাকৃতিক (Super natural) ক্ষমতার অধিকারী নেতা হিটলারই তাদের নেতৃত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অশ্রু সজল নয়নে হিটলারের ক্রুদ্ধ, যুধ্যমান ভ্রমগ্রস্ত ও পক্ষপাতমূলক বক্তৃতা শুনে জনতা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত আর বাস্তবতার সকল জ্ঞান তারা হারিয়ে ফেলত।

বিখ্যাত ন্যাৎসী নুরেমবার্গ র‍্যালী বা সমাবেশগুলো "রোমান্টিক মগজ ধোলাই"-এর পরিষ্কার বহিঃপ্রকাশ। আমেরিকান গবেষক মাইকেল বাইজেন্ট, রিচার্ড লেই আর হেনরী লিংকন নিম্নের ভাষায় এই সভাগুলোর বর্ণনা দেন ঃ

> কুখ্যাত নুরেমবার্গ র‍্যালী সে ধরনের কোন রাজনৈতিক র‍্যালী ছিল না যে ধরনের র‍্যালী (Political) আজ পশ্চিমা দেশে দেখা যায় বরং তা ছিল ধূর্ততার সঙ্গে মঞ্চ পরিচালিত এক ধরনের থিয়েটার, যা গ্রীক ধর্ম উৎসবগুলোর একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান গঠন করে থাকে। পোশাক ও পতাকার রং, দর্শকদের আসন গ্রহণ, নৈশ সময়, স্পটলাইট ও ফ্লাড লাইটের ব্যবহার, সময়জ্ঞান – এসবগুলো ব্যাপারই সঠিকভাবে বিবেচনা করা হত। ফিল্ম ক্লিপগুলো চিত্র তুলে ধরে যে, মানুষ নিজেদের মাতাল করছে "Sieg Heil"- মন্ত্র পড়ে, নেতার প্রতি এমন অনুরাগ প্রকাশ করছে যেন সে তাদের দেবতা, আর গান গাইতে গাইতে নিজেদের পরম মগ্নতা আর পরম আনন্দের মধ্যে নিয়ে চলে যাচ্ছে। জনতার মুখমণ্ডলে বোধহীন স্বর্গসুখের ছাপ ---------- এটা প্ররোচনায় সমর্থ কোন ভাষার প্রশ্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে হিটলারের ভাষা মানুষকে প্ররোচিত করার জন্য ছিল বেশ অসমর্থ। প্রায়ই দেখা যেত তার ভাষা গতানুগতিক, মামুলি, শিশুসুলভ, পুনরাবৃত্তি প্রবণ, এতে কোন সারাংশ থাকত না। কিন্তু তার বক্তৃতায় ছিল সর্পবিষের শক্তি, ছন্দোময় স্পন্দন এটিকে ঢাকের স্পন্দনের ন্যায় সম্মোহনী করে তুলত আর তা গণআবেগের সংক্রমণী বিস্তারের সঙ্গে মিলে একটি সীমাবদ্ধ জায়গায় হাজার হাজার একত্রীভূত লোকের চাপের সঙ্গে মিশে ----------গণ হিস্টেরিয়া সৃষ্টি করত ---------- কেউ হিটলারের র‍্যালীতে যা দেখবেন তাহল "সচেতনতার পরিবর্তন" যেমন মনোবিজ্ঞান বিশারদগণ সাধারণতঃ এ ধরনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে থাকেন।"[১১]

আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, নাৎসী সভাগুলো ছিল গণসম্মোহনের অধিবেশন (Mass Hypnosis Sessions) যা মানুষের বিচারবুদ্ধি বৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অপহরণ করে বা কেড়ে নিয়ে যেত, আর তাদের রোমান্টিকতার আচ্ছন্নতায় ডুবিয়ে রাখত। এই রোমান্টিক হিস্টেরিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়ে ৫৫ মিলিয়ন লোকের জীবন কেড়ে নেয়।

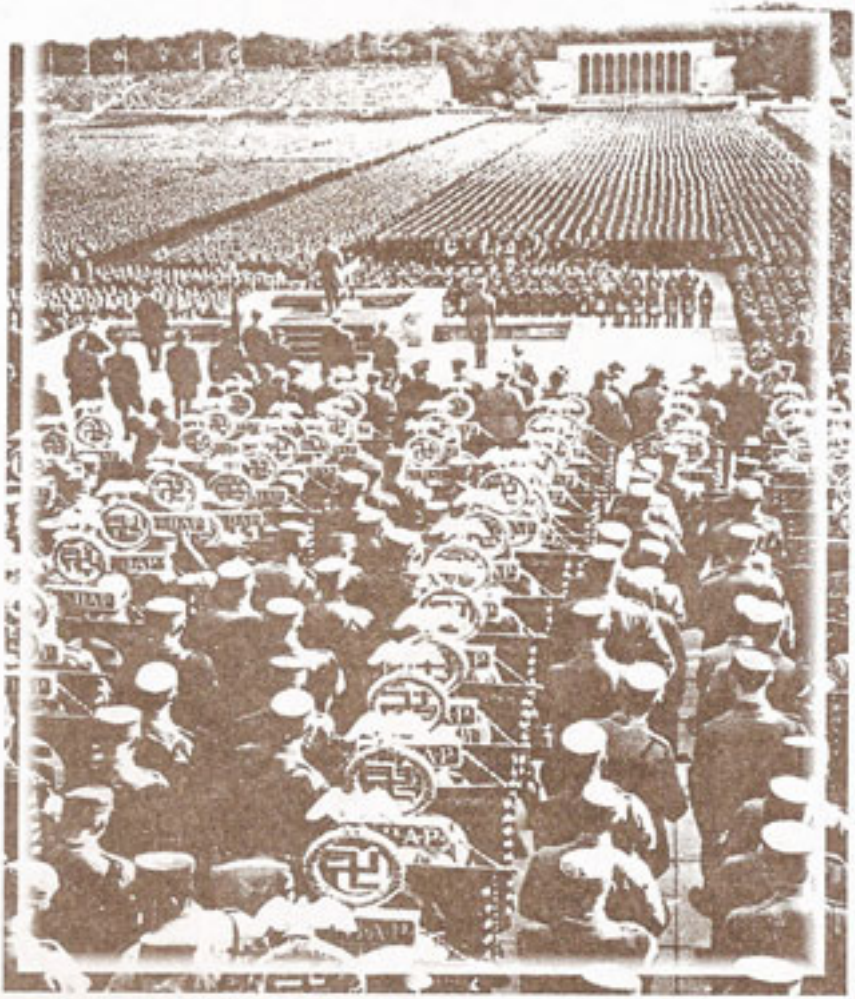

জনগণের মাঝে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদী সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলতে "জার্মান সেনা" "জার্মান লোক", "জার্মান পতাকা", "জার্মান রক্ত" ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল

মানুষ শয়তান কর্তৃক উৎসাহিত আবেগপ্রবণতা দিয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে হিটলারের কথা শুনত এমনকি তার অমানবিক কার্যাবলীকেও হাততালি দিয়ে প্রশংসা করত। সে রোমান্টিকতা উন্মাদনার এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে শিশুদেরও শেখানো হত, ফলে তারাও বিকৃতির পথে বিচ্যুত হতে থাকে

রোমান্টিকতার ধ্বংসাত্মক পরিণামগুলোর একটিমাত্র উদাহরণ হল নাৎসীবাদ। রোমান্টিকতা যেহেতু মানুষের বিচারবুদ্ধি কেড়ে নেয় আর তাদেরকে নিজেদের আবেগের ক্ষমতার অধীন করে রাখে, সেজন্য তা তাদেরকে সবধরনের বিকৃতির প্রতি লোভাতুর করে তুলতে পারে। সে কারণেই রোমান্টিক ব্যক্তিকে ভুল পথে চালানো সহজ। যথাযথ পরিবেশ পেলে খুব কম সময়ের মধ্যে সে একজন একান্ত সাম্প্রদায়িক কিংবা ফ্যাসিস্টে পরিণত হতে পারে। যাইহোক, অন্যান্য দৃষ্টান্তে, তারা কমিউনিস্ট জঙ্গি হতে পারে, লেলিনবাদী কুচকাওয়াজ সঙ্গীত গাইতে গাইতে নিরপরাধ লোককে আক্রমণ করতে পারে কিংবা এমনকি নিজের বোধশক্তি হারিয়ে এমনতর পর্যায়ে যেতে পারে যে, নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয় আর মনে করে যে তার এ কাজটি ন্যায় সঙ্গতই। রোমান্টিক লোকের বেলায় কোন এক ক্ষণে যেমন কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব, তেমনি এর পরের মুহূর্তে তাকে আবেগপ্রবণ হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও দেখা যেতে পারে। একবার বিচক্ষণতা দিয়ে কাজ না করার ফলে যে উন্মাদনার প্রকাশ ঘটতে পারে তার কোন সীমারেখা নেই, আর তখন একজন তার আবেগের ফাঁদে বন্দী হয়ে যায়, আরো ভাল করে বলতে হয় যে, শয়তান তার মাঝে অতিমাত্রার যুক্তিহীন আবেগের উদ্রেগ ঘটায়।

রোমান্টিকতার বিবিধ ভাবাদর্শ

আর সে বলে ঃ "আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুগামী করে নেব। এবং তাদের আমি পথভ্রষ্ট করবই, তাদের বৃথা আশ্বাস দেবই, আর আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দেব যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি-বিকৃত করে দেয়।" আর যে কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে।

[কোরআন: ৪ : ১৮-১১৯]

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোয় আমরা "রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ" থেকে উদ্ভূত রোমান্টিক পরিণতিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। রোমান্টিকতা মানবজাতির উপর যে বিপর্যয়গুলো নিয়ে এসেছিল তাদের কতক দেখার জন্য চলুন এবার আমরা রোমান্টিকতার অন্যান্য কতগুলো বহিঃপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, যে ভাবাদর্শটি আমরা পর্যবেক্ষণ করব তা রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের মতই সমান হৃদয়গ্রাহীঃ সেটি হল কমিউনিজম।

কমিউনিস্ট রোমান্টিকতা

কমিউনিজম, যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির একটি স্বীকৃত ভাবাদর্শ হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) আর ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) বস্তুবাদ দর্শনটি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, তারা ভেবেছিলেন যে, এই দর্শনটি তারা সামাজিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে "ইতিহাসের সূত্র বা আইনগুলো" ব্যাখ্যা করবেন। মার্কস ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে চিহ্নিত করেন ঃ সে সময়ের প্রাগ্রসর দেশগুলো, যেমন ইংল্যাণ্ড "পুঁজিবাদী পর্যায়ে" অবস্থান করছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এর পরবর্তী পর্যায়ে অনিবার্যভাবেই শ্রমিকদের একটি বিপ্লব সংঘটিত হবে যা কিনা তখন সামাজিক পর্যায়ের সূচনা করবে। তিনি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বিপ্লবটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংঘটিত হবে, তার মানে, শ্রমিকদের নিজেদের পদক্ষেপ থেকেই বিপ্লবের উৎপত্তি হবে আর তা ঘটবে ইংল্যাণ্ড আর অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোয়।

অবশ্য মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য হয়নি। এগুলো যে বাস্তবায়িত হবে না - এ সত্যটি মার্কসের মৃত্যুর ৩০-৪০ বছরের মধ্যেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ইংল্যাণ্ড কিংবা অন্য কোন শিল্পোন্নত দেশেই বিপ্লব ঘটেনি, পক্ষান্তরে শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাল।

কমিউনিজমের যৌক্তিকতার দাবি অসত্য

সামাজিক বিজ্ঞানের নাম নিয়ে তৎকালে সংঘটিত বহু ঐতিহাসিক ভ্রান্তির মাঝে একটি হল মার্কসের মতবাদকে গণ্য করা উচিত ছিল আর তাই সেটাকে পরিত্যাগ করাও উচিত ছিল। কিন্তু ব্যাপারটি তা হয়নি। নিজেদের মার্কসবাদী

বলে পরিচয়দানকারী একদল লোক অত্যন্ত কষ্ট করে মার্কসের ভিত্তিহীন ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করল। যদিও মার্কস বলেছিলেন যে বিপ্লবটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হবে, কিন্তু আসলে তা মোটেও ঘটেনি, তখন মার্কসবাদীরা সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপ্লবটিকে উসকে দেয়ার পথ খুঁজল, যে সংগঠনটি অস্ত্রবল প্রয়োগের মাধ্যমে এ বিপ্লবটি ঘটাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী যিনি মার্কসের ব্যাখ্যা সংশোধনের চেষ্টা করেন ও তার অবাস্তব ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য অজুহাত তৈরী করতে চেয়েছিলেন তিনিই হলেন - লেলিন।

লেলিন দৃঢ়ভাবে এ মত পোষণ করছিলেন যে, অগ্রসর দেশগুলো যেমন ইংল্যাণ্ডে এ বিপ্লব সংঘটিত হবে না বরং রাশিয়ার ন্যায় শিল্পে অনুন্নত দেশে তা ঘটবে। তিনি বলেন যে, সেখানে কমিউনিজম সফল হবে, আর সেখান থেকেই সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। তার স্বপ্নটি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তিনি বিপ্লবের প্রস্তুতি তৈরিতে রাশিয়ার ভিতরে ও বাইরে বহু বছর কাটালেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয় - তা-ই তাকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিল।

মার্কসের ন্যায় লেলিনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও ব্যর্থ হল। না তার প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলো সফল হয়েছিল, না কমিউনিজম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিহাসের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। আর তার দখলকৃত দেশগুলোতে জোর করে বলবত করা কমিউনিস্ট পদ্ধতিখানাও ভেঙ্গে গিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মারাত্মক ও সবচেয়ে ব্যর্থ রাজনৈতিক পরীক্ষা হিসেবে কমিউনিজমকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে।

মার্কসবাদী যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা প্রমাণিত হয়ে গেছে - এর কারণ শুধু এর অপরিপূর্ণ অঙ্গীকারই নয় আর তা থেকে জন্ম নেয়া সিস্টেমের ভাঙ্গনও নয় ; বরং যে দর্শনের উপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিল তার ব্যর্থতাও একটি কারণ। বস্তুবাদ দর্শনের মূল অঙ্গন যেটি কিনা মার্কসবাদের ভিত্তি - তাই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো দিয়ে সন্দেহপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ

১. বস্তুবাদ দৃঢ়ভাবে দাবি করে যে, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিরকালের জন্য বর্তমান রয়েছে আর তাই বস্তুকে সৃষ্টি করা হয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে গ্রহণ করে

কমিউনিস্ট রোমান্টিকতার সবচেয়ে সুপরিচিত প্রতীকগুলো হলঃ প্রোলেতারিয়া বা সর্বহারাদের শৃংখল ভেঙ্গে ফেলা, মুষ্টিবদ্ধ মুষ্টির ছবি, বিপ্লব সঙ্গীত যা আমরণ সমাজতন্ত্রকে রক্ষা বা সমর্থন করে যাবে

নেয়া Big Bang Theory বা মহা বিস্ফোরণ মতবাদ এ ইঙ্গিতটি প্রদান করছে যে বস্তু ও সময় অস্তিত্বহীন অবস্থা (অর্থাৎ শূন্য থেকে) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদটি প্রস্তাব করে যে, ১০-১৫ বিলিয়ন বছর আগে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে জন্ম নিয়েছে, যা শূন্যাবস্থা

থেকে আকস্মিক ও ক্ষুদ্র কর্মতৎপরতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। অন্য কথায় সত্য কথা হল "মহা বিস্ফোরণ" মতবাদটি প্রকাশ করছে যে হঠাৎ করে কিছুই ঘটেনি, শূন্যাবস্থা বা অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই কার্যকলাপের সূত্রপাত হয়েছে, আর ঐ কর্মতৎপরতার পরেই বস্তু ও সময় আবির্ভূত হয়েছে। এই মতবাদ বস্তুবাদ দাবিকে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহপূর্ণ বলে প্রমাণ করে, আরো প্রমাণ করে যে, বস্তু, সময় এবং সর্বপ্রথম কর্মতৎপরতা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।

২. বস্তুবাদ দাবি করে যে, বস্তু ও সময় উভয়েই অবিমিশ্র অর্থাৎ এরা সবসময় বিরাজমান, অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী। অবশ্য আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার মতবাদ (Theory of Relativity) প্রমাণ করেছে যে, বস্তু ও সময় অবিমিশ্র নয়, বরং সেগুলো কেবলই এমন কিছু উপলব্ধি যা পরিবর্তন করা যায়।

৩. বস্তুবাদ দাবি করে যে, মানুষের মানসিক কার্যাবলী ও ধারণ ক্ষমতাকে বস্তুগত ব্যাখ্যায় নিয়ে আসা যায়। অবশ্য মস্তিষ্কের জটিল বিষয়ের আবিষ্কার এমন কিছু বিভিন্ন ধরনের মানসিক কার্যাবলীর অস্তিত্ব প্রদর্শন করে, যেগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন বৈশিষ্ট্য মস্তিষ্কে পাওয়া যায় না, আর, মানুষের মানসিকতা বস্তুর বাইরে অবস্থান করে এবং তা আত্মার মালিকানাধীন - এই সত্যটুকুও এই আবিষ্কারগুলো প্রমাণ করেছে।

৪. বস্তুবাদ দৃঢ় প্রতিপন্ন করে যে, জীবিত বস্তুকে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং ডারউইনের বিবর্তন মতবাদের দাবি অনুযায়ী, দৈব ঘটনায় (By Chance) জীব অস্তিত্বে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে এ দাবিটি নস্যাৎ হয়ে গেছে আর এখন বুঝা গেছে যে জীবিত বস্তুতে একটি অবশ্য স্বীকার্য "ডিজাইন" বা "নকশা" বিদ্যমান যা এই সত্যের দিকে পরিচালিত করে যে আল্লাহই সকল প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।

যদি কোন ভাবাদর্শকে যৌক্তিক বলে দাবি করা হয়, কিন্তু যুক্তি বা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষার নিরিখে এই দাবিগুলো না টিকে ; তদুপরি, যদি সরল সত্য এ দাবির সত্যতা বা বৈধতা প্রমাণ না করে তবে সেই ভাবাদর্শের দাবিগুলো অবশ্যই প্রত্যাখান করা উচিত।

যারাই এই ভাবাদর্শগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের অবশ্যই সেগুলো যৌক্তিকভাবে অনুসন্ধান করে দেখা উচিত আর তখনি তারা এর অবৈধতা উদ্‌ঘাটন করতে পারবে ও তা পরিত্যাগ করবে। যদি কমিউনিস্টগণ এমন

কমিউনিজমের জনকগণ : মার্কস (বামে), আর এঙ্গেলস (ডানে) । মাঝখানে মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' এর রাশিয়ান একটি অনুবাদ

ধারার লোক হতেন যারা রোমান্টিক স্বপ্নের জগতে বাস না করে তাদের বিচারবুদ্ধি, যুক্তি আর সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করে থাকেন তবে এ সময়ের মধ্যে কমিউনিজম শত শত বার অসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হত।

যেহেতু রোমান্টিকতার মাঝেই কমিউনিজমের ভিত্তি বিদ্যমান সেহেতু যারা একে সমর্থন করে চলেছে, তারা যুক্তি ও বিজ্ঞানের ন্যায্যতার বিরুদ্ধে গিয়েই কেবল তা করতে পারছে, আর এটা যে ভাবাদর্শ হিসেবে অপ্রচলিত - এ সত্যটির দিকে চোখ বুজে থেকেই তা তারা সমর্থন করে যায়। ইতিপূর্বে, যখন মার্কসবাদের মৌলিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে দেখা গেল - তখনই এটাকে দূরে ঠেলে দেয়া উচিত ছিল। যাই হোক, একে পরিত্যাগ করা হয়নি। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো সহসা এসে হাযির হল; আর বিপ্লব, গৃহ যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ আর সন্ত্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে মার্কসবাদী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ব্লকের পুরোটাই ভেঙ্গে গেল, লাল চীন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করল। অবশ্য, এখনো কমিউনিজম পরিত্যাগ করা হয়নি। এমনকি আজও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যে বিপ্লবের কথা তারা বলে, তা একটি অলীক কল্পনা - এ সত্য জানা সত্ত্বেও তারা শুধু এ কারণে রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে যে, যেন তাদের কমিউনিজম পরিত্যাগ করতে না হয়। রোমান্টিকের ন্যায়, অন্ধভাবে, একগুঁয়েমি সহকারে তাদের সেকেলে ভাবাদর্শ

আঁকড়ে ধরে তারা যখন কমিউনিস্ট কুচকাওয়াজ সঙ্গীত গাইতে থাকে তখন তারা পাগলের ন্যায় নিজেদের ও তাদের কমরেডদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

যে সকল লোকেরা কোন ধারণা কিংবা ভাবাদর্শের খাতিরে নিজেদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা আসলে ভাবাবেগের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা ভ্রান্তভাবে সাহসী মনে করে যে কাজগুলো বিবেচনা করে, সেগুলো দিয়েই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রবণতা তারা দেখায়

এ ব্যাপারটি প্রমাণ করে যে কমিউনিজম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ভাবাদর্শ নয়, আর যারা তা সমর্থন করে, তারা এজন্য করে যে, কমিউনিজমের প্রতি যৌক্তিক অঙ্গীকারসমূহের বাইরে অন্য কোন উৎস থেকে তাদের সমর্থন করে যাওয়ার কারণগুলো উৎপন্ন হয়। "চরম গোঁড়ামি", "অন্ধ বিশ্বাস" কিংবা মোহাচ্ছন্নতা যাকে বলা হয় "Idel fixe"– এগুলোকে বহু লোক এমন অঙ্গীকারের কারণ হিসেবে বিবেচনা করে অধিকতর অনুসন্ধানের ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এ অনুমানকৃত চরম গোঁড়ামির নিচেই রয়েছে রোমান্টিকতার ভয়াবহ প্রভাব।

তার মানে, রোমান্টিকতার যাদুর মায়া থেকেও কমিউনিজম শক্তি আহরণ করে।

কমিউনিস্ট রোমান্টিকতার দৃষ্টান্তসমূহ

প্রথমদিকে মানুষ কমিউনিজমের রোমান্টিক স্পিরিট সম্বন্ধে সচরাচর অবহিত ছিল না, কেননা কমিউনিস্টগণ সর্বদা বিজ্ঞান, দর্শন ও যৌক্তিকতার আলোকে কথা বলে থাকেন। যাই হোক, আসলে কমিউনিস্টগণ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাদের ধারণাগুলো বিকশিত করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো তাদের উদ্দেশ্য বা "বুর্জোয়ার" সঙ্গে মেলে না, সেগুলো তারা অন্ধভাবে প্রত্যাখান করে। স্টালিন আরেকটু এগিয়ে এতদূর পর্যন্ত যান যে, "বুর্জোয়া" ও "প্রলেটারিয়েট" বিজ্ঞানের মাঝে একটি উদ্ভট পার্থক্য তৈরি করে তার পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কারটি একটি সিস্টেমে আবদ্ধ করেন।

অন্যদিকে, আমরা যদি কমিউনিস্ট প্রকাশনা, ম্যাগাজিন, কবিতা কিংবা কুচকাওয়াজ সংগীতের দিকে বিস্তারিতভাবে তাকিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব যে, তাদের ভাবাদর্শ রোমান্টিকতার শক্ত বাঁধনে বাঁধা। তারা অতিমাত্রার আবেগপ্রবণ অনুরাগের জন্ম দিয়ে তাদের নির্দিষ্ট কতক ধারণাকে আরাধনার বস্তুতে পরিণত করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল "বিপ্লবের" ধারণাটি। একজন কমিউনিস্টের জন্য বিপ্লবই হল সকল মন্দের সমাপ্তি আর সকল মঙ্গলের শুরু। তারা আশাহতভাবে এমন এক কল্পনাবিলাস দ্বারা বিমুগ্ধ থাকে- যেটি কখনও বাস্তবায়িত হবার নয় এটাও তারা জানে। তারা কখনও বিপ্লবের ধারণাটি সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়াস চালায় না, কিংবা উদাহরণস্বরূপ কখনও জিজ্ঞেস করে না যে, "কি উদ্দেশ্যে বিপ্লবটি কামনা করা হচ্ছে ?", "সেই বিপ্লবের যুক্তি কি হতে পারে যেখানে নিরপেক্ষ লোকের দলকে হত্যা করা হয় আর গোটা সমাজই ভোগে ?" "বিপ্লব ছাড়া গরীবদের জীবন ব্যবস্থার কি কোন উন্নতি সাধন করা যেতে পারে ? "এটা অর্থনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করবে ?" "কিভাবে তখন এই দেশ পরিচালনা করা যায় ? এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কিভাবে সমাধান করা যাবে।" .....

একজন কমিউনিস্ট এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব আছে কি নেই তা কখনও ভেবে দেখে না ; তার একমাত্র গন্তব্য হল বিপ্লব। তাকে যদি এ প্রশ্নগুলোর কোন একটি উত্তর সরবরাহ করতেই হয় তবে সে লেলিন, স্টালিন কিংবা মাও-এর বৈশিষ্ট্যসূচক ও ঘন ঘন উচ্চারিত শ্লোকগুলোর উদ্ধৃতি দিবে কিন্তু সে নিজে এসব প্রশ্নের উত্তরের নিমিত্তে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে দেখবে না। তাকে বিপ্লবের ধারণার সঙ্গে ভালবাসার বন্ধনে যা জড়িয়ে রাখে তাহল, বিপ্লবের

কমিউনিজমের সবচেয়ে বিরক্তিকর দিকটি ছিল এমন যে, তাদের যে সকল নেতারা মিলিয়ন মিলিয়ন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী অপরাধী ছিল তাদেরকেই আবার তারা চিত্রিত করত অতিমানব হিসেবে যারা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের প্রচার-প্রপাগান্ডার উদ্দেশ্য ছিল একটিই, যেন মানুষ তাদের নেতাদের দিকে আবেগাত্মক ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়

উদ্দেশ্যে লিখিত মানসিক চাঞ্চল্য উদ্রেককারী কবিতা ও আবেগপ্রবণ হয়ে গাওয়া বিপ্লবের কুচকাওয়াজ সঙ্গীত। "ফুলে ফুলে ঢাকা মনোরম দেশ" আর "দিগন্তে রক্তিম সূর্যের" - এ কথাগুলো কমিউনিস্ট সাহিত্যে ঘনঘন উচ্চারণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন কমিউনিস্ট আর বিপ্লবের ধারণার মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তা রোমান্টিক ভালবাসার গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। ইউনিভার্সিটি, বইমেলা আর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কমিউনিস্ট বুথ রয়েছে ; যদি এদের কোন একটিতে কিংবা কমিউনিস্ট বার কিংবা ক্যাফেতে আপনারা যান, তবে সেখানে এই রোমান্টিকতার প্রতি উদ্যম জাগানো বহু প্রতীক দেখতে পাবেন।

একজন শক্তিমান প্রোলেটারিয়েট তার শৃংখল ভাঙ্গছে এমন পোস্টার, দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির চিত্র, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে মরে যেতে উৎসাহব্যঞ্জক বিপ্লব

সঙ্গীত- এগুলো কমিউনিস্টদের সবচেয়ে সাধারণ প্রতীক।

কমিউনিস্টদের পোশাকে কখনও কখনও এই রোমান্টিকতার প্রতিফলন ঘটে। একজন তরুণ কমিউনিস্টকে প্রায়ই খাকী জ্যাকেট ও জঙ্গি-টুপী পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট গ্যারিলা চেগুয়েভারার সঙ্গে সে নিজেকে এক করে ফেলে, এতে সন্দেহ নেই যে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাঝে তার কামরায় আপনি "চে"- এর একটি পোস্টার খুঁজে পাবেন। একজন কমিউনিস্ট আর একজন পপ তারকার মোহে রোমান্টিকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা একজন কলেজ ছাত্রের মাঝে একমাত্র পার্থক্য হল, কোন ধরনের তারকা সে বেছে নিয়েছে সেটি ; তার (কমিউনিস্ট লোকটির) তারকা একজন গায়ক না হয়ে বরং একজন গেরিলা যোদ্ধা হবে।

কমিউনিস্ট রোমান্টিক ভাব বিবেচনা করার মত অন্য একটি কৌতূহলকর দৃষ্টান্ত হল যে, তারা নিজেকে কষ্ট দিয়ে কিংবা লোকজন যেন তাদের জন্য দুঃখ করে এমন কোন কাণ্ড ঘটিয়ে তারা বিরাট আনন্দ পায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন জঙ্গি কমিউনিস্ট জেলের ভেতরে **"অনশন ধর্মঘট"** শুরু করতে পারে, সামান্য ছোটখাট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিজে না খেয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তৈরি করে। একদিকে, যে কষ্ট তাকে ব্যথা দেয় তাতে সে আনন্দ অনুভব করে,

আর অন্য কেউ তার নিজের এবং তার দুরবস্থার জন্য সহানুভূতি দেখালে সে তা উপভোগ করে। যেখানে অন্যদিকে, সে তার বন্ধুদের মাঝে বীর হিসেবে পরিচিতি পেতে গর্ব অনুভব করে।

কমিউনিস্টরা তাদের কষ্টে যে আনন্দ পায় তা কখনো কখনো উঁচু স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। কমিউনিস্টরা তাদের বিক্ষোভের সময় কখনো কখনো ভয়ংকর পাশবিক কাজ করে ; যেমন - তারা তাদের দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত কোন একজনকে নিয়ে লোহার

এই পোস্টারটি কমিউনিস্ট রোমান্টিকতার একটি আদর্শ প্রতীকীকরণ। নেতার ও তার আদর্শের প্রতি তার জনগণের আবেগময় অনুরাগকে সংহত করতে এই পোস্টারগুলো কাজে লাগায় কমিউনিস্টরা

দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখে, তার উপর তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে দিল, তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল আর দগ্ধ হওয়ার সময় কমিউনিস্ট রণসঙ্গীত গাইল। রেকর্ডকৃত ছবি হতে বোধগম্য হয় যে, যে বিদ্রোহীরা এই অচিন্তনীয় পাশবিক কাজ করে তারা নাৎসী সমাবেশের জনগণেরই অনুরূপ ; তারা তাদের "সচেতনতার বিচ্যুতিতে" পতিত হয় আর এক আবেগপ্রবণ ও মানসিক মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়।

এই ভাবাদর্শের ধারণা কোনকালেই বাস্তবায়িত হবার নয় – এটি জেনেও

একগুঁয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে ভাবাদর্শটির প্রতি নিজেকে অনুরক্ত রাখা কেবলমাত্র একজন কমিউনিস্টের পক্ষেই সম্ভব। ভাবাদর্শের প্রতি এই অন্ধ অঙ্গীকার তাদের এসব দম্ভোক্তির মাঝেই প্রদর্শিত হয়; যেমন: "যদি তা ভুল হয় আমি পরোয়া করি না, সফল হই বা না হই তাতেও আমি পরোয়া করি না, আমি একজন কমিউনিস্ট, আর মরণ পর্যন্ত আমি তাই থাকব।" নিশ্চিতভাবে একজন যুক্তিবাদী মানুষ কখনো এই ধরনের আচরণ দেখাতে পারে না। এই অন্ধ অনুরাগ এক ধরনের উন্মাদনার অনুরূপ যা-কিনা একজন নারীর জন্য একজন নরের মোহাচ্ছন্ন কামনার মাঝে দেখা যায়, যেখানে নারীটি তাকে প্রতারণা আর অপমানিত করেছে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে তার ভালবাসার ইতি টানতে রাজী নয়।

তাহলে এটা দেখানো হয়েছে যে, কমিউনিজম সরলভাবে রোমান্টিকতার অস্ত্রেরই একটি উপাদান যেটিকে ব্যবহার করে শয়তান মানুষের বিচারবুদ্ধিকে অপহরণ করে আর আল্লাহর প্রতি নিজেদের বিশ্বাস থেকে টেনে তাদের বের করে আনে। কমিউনিজমকে যৌক্তিক দর্শন আর ভাবাদর্শ বলে দাবি করা হলেও এটা সাধারণ যুক্তি ও বিজ্ঞান পরিপন্থী ধারণাসমূহ দিয়ে পরিপূর্ণ।

লালচীন ও সোভিয়েত রাশিয়াতে বিশাল কমিউনিস্ট সমাবেশে সমাগত লোকের মনস্তত্ত্ব হিটলারের জার্মানীর লোকজন থেকে সত্যিকার অর্থে ভিন্ন নয়। যে বল তাদেরকে তাদের ব্রতের প্রতি অজ্ঞভাবে টেনে নিয়ে যায় তাই তাদের অবচৈতিক রোমান্টিকতা

অন্ততঃ এক শতাব্দীকাল পার হয়ে গেছে, সে সময়টিতে কমিউনিস্টগণ নাছোড় বান্দার মত তাদের ভাবাদর্শ সমর্থন করেই যাচ্ছে - এতে এটাই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এ কারণটির প্রতি তাদের যে অনুরাগ - তা'ই হল রোমান্টিক অনুরাগ।

ধর্মের নামে রোমান্টিকতা

যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে ঃ "আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এমন করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদের এ আদেশই দিয়েছেন।"

বলুন, "আল্লাহ কখনই অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথাই বলছ যা তোমরা জান না?" [আল-কোরআন: ৭ : ২৮]

রোমান্টিকতা নিজে একটি পূর্ণ বিকশিত আদর্শবাদ হলেও এটির এমনি প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রয়েছে যে, এরই ভিতর দিয়ে অপরাপর বহু আদর্শবাদ সঞ্চারিত হয় ; রোমান্টিকতা এই আদর্শবাদগুলোকে একটি আবেগাত্মক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে - যা আদর্শবাদগুলোকে মানুষের বিচারবুদ্ধি অপহরণ করে নেয়ার ক্ষমতা দান করে। এটা যেমন ফ্যাসিবাদ (Fascism) এবং সাম্যবাদের (Communism) মত সম্পূর্ণ অধর্মীয় ও বিকৃত আদর্শগুলোর ভিতর অনুপ্রবেশ করেছে, তেমনি সময়ে সময়ে ধর্মের ছদ্মাবরণেও এর প্রভাব অনুভূত হয়।

এ বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করার পূর্বে সর্বপ্রথম আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে। যে আন্দোলনটি ধর্মের নামে করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়, সেটা অপরিহার্যরূপে সত্যিকার ধর্মীয় আন্দোলন নাও হতে পারে। পরন্তু, অতীতে বহু ব্যক্তি, দল এবং আদর্শসমূহ ঈশ্বর ও ধর্মের নাম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীদের ক্ষতিসাধন করার নিয়ত করেছে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এমনতর কিছু ঘটনাবলীর উদাহরণ দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহর নবী সালেহ (আঃ) - কে হত্যার নিয়ত করেছিল এক অপরাধী। এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের সময় সে আর তার সঙ্গীরা আল্লাহর নাম নিয়েই শপথ করেছিল ঃ

তারা বলল ঃ 'তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে কসম কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে অবশ্যই হত্যা করব, তারপর তাঁর অভিভাবককে অবশ্যই বলে দেব যে, আমরা তাঁর পরিবারবর্গের হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করিনি, আর আমরা তো সত্যবাদী।' [কোরআন: ২৭ : ৪৯]

পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারী পৌত্তলিকরা প্রায়ই নবীগণকে "আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী" বলে অভিযুক্ত করত, তারা এই সত্যটিরই নির্দেশ করত যে তারা আসলে নিজেদেরকেই ধার্মিক ও খোদাভীরু বলে ভাবত [কোরআন: ৪২ ঃ ২৪]। উদাহরণস্বরূপ, মুসা (আঃ) - এর সামনে ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে একটি বিকৃত দাবি করে বলল ঃ

"------- তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করে ফেলব, আর সে তাঁর পালনকর্তাকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়, পাছে সে

তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেয় কিংবা দেশময় বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।" [কোরআন: ৪০ : ২৬]

এতে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের নামে ও ছদ্মাবরণে বিকৃত চিন্তা করা এবং বিকৃত কাজ করাও সম্ভব। আর সেই বিকৃত কাজগুলোর তালিকার শীর্ষেই রয়েছে রোমান্টিকতা, যে কাজগুলো ধর্মীয় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্মের সঙ্গে এদের মোটেও কোন সম্পর্ক নেই।

রোমান্টিকতাকে যে কিভাবে ধর্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় তা বুঝতে গেলে সর্বপ্রথম "আন্তরিকতার" ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা দরকার। কেবলি আল্লাহর অনুমোদন লাভের লক্ষ্যে যা কিছু করা হয় - তাই হল আন্তরিকতা। আন্তরিকতার সঙ্গে কোন কাজ করা হলে, সেই কাজটি আল্লাহর দৃষ্টিতে উপাসনা হিসেবে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, নামায পড়া, রোজা রাখা, দান করা আল্লাহর জন্য কোন কাজ করা আর সেবাধর্মী অন্যান্য সকল কাজ– এসব যদি আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় তবে এগুলো ইবাদত বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর অনুমোদন লাভের নিয়ত না করে যদি কোন উপাসনা করা হয় তবে কোরআনে তা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অসিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে ঃ

"অতএব দারুণ দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।"

[কোরআন: ১০৭ : ৪-৬]

এ বিষয়টি নবী করীম (দঃ) - এর হাদীসেও পরিষ্কার, তিনি বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা সেসব কাজ গ্রহণ করে নেন যদি সে কাজগুলো সম্পূর্ণ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত করা হয়ে থাকে।"[১২]

রোমান্টিকতা এ উপায়েই ধর্মকে বিকৃত করে থাকে। আল্লাহর অনুমোদন লাভের জন্য নয়, বরং অন্য কোন উদ্দেশ্যে ধর্মকে পরিচালিত করাই রোমান্টিকতার কাজ। ধর্মকে রোমান্টিকতা এক আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা হিসেবে উপস্থাপিত করে, যাতে (ধর্মের অভিজ্ঞতা) মানুষ তার আবেগের প্রয়োজন মেটায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মচর্চা করা হয় না।

আমেরিকায় ধর্মের ছদ্মাবরণে রোমান্টিকতা ধর্মীয় সংগঠনগুলোর বহু সদস্যের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯৩ সালে ডেভিড কোরেশ (উপরে বামে) তার অনুসারী ৮০ জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। ১৯৭৮ সালে জিম জোনসের (উপরে ডানে) নেতৃত্বে সর্বমোট ৮০ জন সদস্য আত্মহত্যা করে

রোমান্টিকতা এ সূক্ষ্ম কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয় ও তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণার দিকে পরিচালিত করে– যারই শেষ ফলাফল হল "মরমীবাদ"(Mysticism)। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাই হল ধর্ম, এটি উপলব্ধি করা থেকে যখন মানুষ "মনস্তাত্ত্বিক উল্লাসের" একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে তখনই কিছু সংখ্যক মরমীবাদী

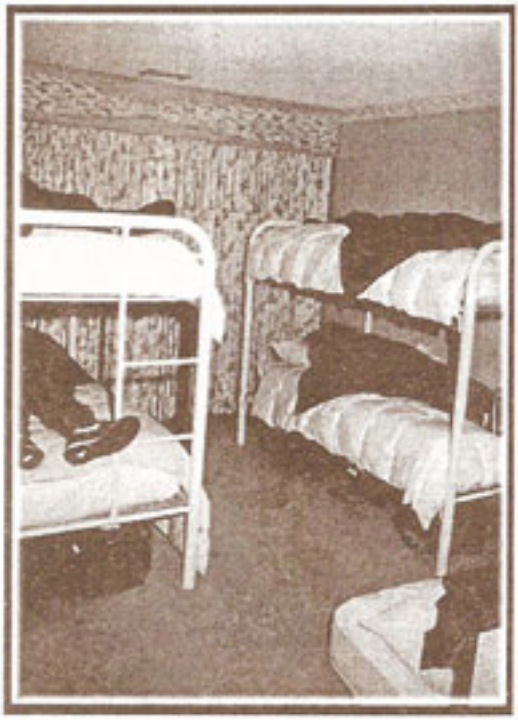

আবেগের প্রভাবে মানুষ বিকৃত ধর্মের সদস্য হয়ে যায় এবং বিচারবুদ্ধি ও প্রকৃত ধর্মের সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। হার্ফ এপল হোয়াইট (উপরে) তার সদস্যদের বলেছিল, "ভৌ" নামে একজন এসে তাদেরকে অজানা উড্ডয়নশীল বস্তু (UFO) দ্বারা দূরে কোথাও নিয়ে যাবে। তারা তাকে বিশ্বাস করে এবং দলবদ্ধভাবে আত্মহত্যা করে

অনুশীলন অন্বেষণ করা শুরু হয়, আর ঐ মিথ্যা প্রচেষ্টার গভীর স্তরে এগুলো (মরমীবাদী-Practice) নিমজ্জিত করা হয়।

কোরআনে আল্লাহ যে ধর্মের কথা প্রকাশ করেছেন সেই ধর্মকে যখন আমরা রোমান্টিকতাপূর্ণ ধর্মের সঙ্গে তুলনা করি তখন বড় ধরনের কিছু পার্থক্য চিনে নিতে পারি ঃ

১. কোরআনে আল্লাহ মানবজাতিকে আদেশ করেছেন তারা যেন তাদের জ্ঞান ও মনকে ব্যবহার করে, আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, আর এ উপায়ে তারা যেন ঈমানের পথে আসতে পারে। যাই হোক, রোমান্টিক ভাব সঙ্গে নিয়ে ধর্মের পথে অগ্রসর হলে তা যুক্তিকে বাদ দিয়ে চলে। এটা মানুষকে তার বুদ্ধির ব্যবহার করতে দেয় না। পক্ষান্তরে, তা তাদেরকে মোটেও চিন্তা না করা সম্পর্কে উৎসাহিত করে।

২. ধর্ম সম্পর্কিত রোমান্টিক ধারণা অনুসারে, কোন ব্যক্তির নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করাকে আর নিজেদের কষ্টের কারণ তৈরি করাকে প্রায়ই

প্রশংসনীয় বলে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টানগণ নিজেদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করে মনে করে যে তারা তাদেরকে যীশুর সন্নিকটে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাচ্যের কিছু কিছু ধর্ম, যেমন বৌদ্ধ ধর্মে - নিজেকে অনাহারে রাখাকে, অস্বস্তিকর কোন স্থানে ঘুমিয়ে থাকা আর অন্যান্য ধরনের আত্মবলিদানের কর্মগুলো মানুষকে পবিত্র করে তুলে বলে গণ্য করা হয়। যাই হোক পবিত্র কোরআনে এমন কোন চূড়ান্ত ধারণা নেই যা অনুসারে মানুষের নিজেকে কষ্ট দিতে হবে। কোরআনে এই আয়াতটি এই বিকৃত রোমান্টিক ধারণাটি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করছে :

"আল্লাহ্ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, বরং মানুষই মানুষের প্রতি জুলুম করে থাকে।" [কোরআন: ১০ : ৪৪]

মানুষের নিজেকে বলিদান করা, বিশ্বাসের নামে নিজেদের দেহে আঘাত বা ক্ষত তৈরি করা - এ বিষয়গুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মে অতি সাধারণ বিষয়। রোমান্টিকভাবে ধর্মের ধারণা করারই ফলাফল এটি

সংক্ষেপে, রোমান্টিক ভাবধারা অনুযায়ী ধর্ম হল এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিকে দেবতা বানানোর প্রবণতাকে উৎসাহিত করে, আর মানুষকে চিন্তাশীল না হতে, আর অতীত স্মৃতি বিধুর কিংবা গৃহকাতর হতে, আত্মবিলোপকারী আর আত্মধ্বংসী হতে উৎসাহিত করে। এটা প্রকৃত ধর্ম হতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত বিশ্বাস ও অনুশীলনসমূহ নিয়ে গঠিত একটি নকল পদ্ধতি।

আল্লাহ মানুষের কাছে কি চান তা জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন না করে মানুষ তার পূর্বপুরুষ হতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গৎবাধা আচরণ এবং চিন্তাধারা অব্যাহতভাবে চালিয়ে নিয়ে ধর্মের পথে অগ্রসর হতেই অধিকতর পছন্দ করে। তারা যৌক্তিকভাবে তাদের চারপাশের পরিবেশের মূল্যায়ন করে জীবনযাত্রা পরিচালনা করে না, বরং চিন্তা ও আচরণে সেই একই ঐতিহ্যগত প্যাটার্নকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। এটা এক ধরনের বিকৃতি যেটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া গেলো ঃ

আর যখন তাদের বলা হয়, "তোমরা এস আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং রাসূলের দিকে," তখন তারা বলে, "আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি।" তবে কি যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা কোন জ্ঞানই না রাখে এবং হেদায়েতপ্রাপ্তও না হয় তবুও ?

[কোরআন: ৫ : ১০৪]

যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদের এ আদেশই দিয়েছেন। বলুন ঃ "আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?

[কোরআন: ৭ : ২৮]

আর যখন তাদের বলা হয়, "তোমরা তার অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন।" তখন তারা বলে, "বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।" যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ডাকতে থাকে তবুও কি ?

[কোরআন: ৩১ : ২১]

উপসংহার

কারো জন্য আল্লাহ তায়ালা যে ধরনের ধর্মচর্চা করা পছন্দ করেন, সে ব্যক্তি যদি সে ধরনের ধর্মের অনুশীলনে সমর্থ হতে চায় তবে সর্বপ্রথম তাকে রোমান্টিকতার পাক হতে বেরিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ নিচের আয়াতটিতে আদেশ করেছেন ঃ **"এটা এ কারণে যে আল্লাহই সত্য ----------"** [কোরআনঃ ২২ : ৬২] আল্লাহই আসল আর এটা উপলব্ধি করতে হলে "বাস্তববাদী" হওয়া দরকার। অন্যদিকে যারা রোমান্টিক ভাবধারা দিয়ে সম্মোহিত হয়ে আছে, তারা হয়ত রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ কিংবা কমিউনিজমের মত বিকৃত ভাবাদর্শগুলো দিয়ে প্রভাবিত হয়, নতুবা ধর্মের রোমান্টিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতার ধারণাগুলো থেকে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে কিংবা ভালবাসার এক প্রকার রোমান্টিক ধারণা দিয়ে প্রভাবিত হয় যা আমরা বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পর্যবেক্ষণ করব।

এমনকি যদিও এ ধারার চিন্তা-ভাবনা দিয়ে প্রভাবিত লোকেরা ধর্মচর্চা শুরু করত, তারা অধ্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক স্থিরতার অভাব অনুভব করত; কেননা রোমান্টিকতা তাদের ত্রুটিপূর্ণ আত্মিক অবস্থার দিকে পরিচালিত করে। বহু লোক রয়েছে যারা রোমান্টিকতার কিছু ধারণা দিয়ে উৎসাহিত হয়ে ধর্মচর্চা শুরু করে, কিন্তু তারা দ্রুত তা পরিত্যাগ করে আবার ধর্মহীন জীবনের দিকে ফিরে যায়।

যাই হোক, আল্লাহ মানুষের প্রতি এ আদেশ করেছেন ঃ

> **তিনি রব আসমান ও জমিনের এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী তাঁর। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে সর্বদা ধৈর্যের সঙ্গে কায়েম থাক। তুমি কি কাউকে তাঁর সমগুণ সম্পন্ন জান ?** [কোরআনঃ ১৯ : ৬৫]

ঈমান থেকে আসে যে প্রকৃত বিচক্ষণতা

.....তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে এক জ্যোতি ও একটি সমুজ্জ্বল কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে স্বীয় অনুমতিক্রমে, আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। [কোরআন : ৫:১৫-১৬]

এই বইটিতে পরবর্তীতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে রোমান্টিকতার প্রভাবগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখব। এ বিষয়টি আলোচনায় সাহস করার পূর্বে, অবশ্য, আমরা এ বইটিতে এ পর্যন্ত যে "বিচক্ষণতা" শব্দটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে এসেছি, সে বিচক্ষণতার ধারণার অর্থ কি তা অবশ্যই আমাদের আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

প্রায়ই আমরা একজন ধীমান (Intelligent) ও একজন বিচক্ষণ (Wise) ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হই। এটি একটি মারাত্মক ভুল। সাধারণত: আমাদের সমাজে "বুদ্ধিমত্তা বা মেধা" (Intelligence) শব্দটি কেবলমাত্র মানসিক তীক্ষ্ণতার বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, যা কিনা প্রাজ্ঞতা (Wisdom) থেকে অনেকটা ভিন্ন।

বিচক্ষণতা বা প্রাজ্ঞতা (Wisdom) একজন বিশ্বাসী বা ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ; আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি বস্তুতে যে সূক্ষ্ম নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রয়েছে তা সেই ঈমানদার ব্যক্তিটি এই গুণটির (Wisdom) বদৌলতেই অনুধাবন করতে সক্ষম হন আর চারপাশের জগৎকে বুঝে নিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই জিনিসগুলো বিবেচনার যেকোন প্রচেষ্টা কেবলই মস্তিষ্কের কারণ ও ফলাফল (Cause & Effect) গণনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, আর তা বাস্তবতার যান্ত্রিক ও সীমাবদ্ধ উপলব্ধিতেই শেষ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) একজন ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর উপর যার রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস, আর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো থেকে প্রাপ্ত শিক্ষানুযায়ী যিনি তার জীবন পরিচালনা করেন। আসলে বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) হল একটি স্বাভাবিক গুণ যা ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রাজ্ঞতা বা বিচক্ষণতা গুণটি কেবলমাত্র বিশ্বাসী বা ঈমানদারগণের মাঝেই বিদ্যমান থাকে। যাদের ঈমান নেই তারা "বিচক্ষণতা" গুণের অধিকারী থেকে পারে না।

বিচক্ষণতা একজন ঈমানদারকে তার মানসিক ক্ষমতা, বিচার-বিবেচনা ও যুক্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের সামর্থ্য দান করে আর এভাবেই তিনি তার গুণাবলীর সর্বোত্তম প্রয়োগে সক্ষম হন। বিচক্ষণতা বা প্রাজ্ঞতাবিহীন একজন ব্যক্তি যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, কোন না কোন স্থলে বা মুহূর্তে সে ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা কিংবা অবিচারের দিকে মোড় নিতে বাধ্য হয়। আমরা যদি ইতিহাসের বিভিন্ন অবিশ্বাসী নাস্তিক দার্শনিকদের জীবন অনুসন্ধান করে দেখি, তবে জানতে পারি যে, তারা ঠিক একই বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন এবং এমনকি পুরোপুরি উল্টো দৃষ্টিভঙ্গী

পোষণ করেছেন। যদিও এটা সত্য যে, তারা অত্যন্ত উঁচু দরের ধীমান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঈমান ছিল না, আর ঈমান না থাকার কারণে তারা যথেষ্ট বিচক্ষণও ছিলেন না, আর সেজন্যই তারা প্রকৃত সত্যের নাগাল ধরতে অক্ষম ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাদেরই কেউ কেউ মানবজাতিকে সীমাহীন ভুলের দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ ধরনের বহু উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই: বহু দার্শনিক, ভাবাদর্শবিদ, কূটনীতিবিদ, যেমন ঃ মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন, ট্রটস্কি, তারা অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও মিলিয়ন কে মিলিয়ন মানুষের উপর বিপর্যয় বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, কারণ তারা তাদের মনকে কার্যকরীরূপে ব্যবহারে অসমর্থ ছিলেন। যাই হোক, বিচক্ষণতাই শান্তি, মঙ্গল ও সুখের নিশ্চয়তা প্রদান করে আর এগুলো অর্জন করে নেয়ার পথও প্রদর্শন করে।

বুদ্ধিমত্তা (Intelligence), অন্যান্য জিনিসের মাঝে, আমাদের জন্য চিন্তা করে দেখতে, উপলব্ধির ধারা তৈরিতে, আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা আর ব্যবহারিক কার্যাবলীতে তা নিয়োজিত করাকে সম্ভবপর করে তুলে। কিন্তু একজন বিচক্ষণ লোক এগুলো ছাড়াও গভীর এক বিবেচনা বা উপলব্ধি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন যেগুলো কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) দ্বারা অর্জন করা যায় না এবং তিনি এই ক্ষমতার বলে (Wisdom) সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হন। সুতরাং একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন একটি 'অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী হন যা একজন বুদ্ধিমান (Intelligent) ব্যক্তির অন্তদৃষ্টির চেয়ে অনেক অনেক প্রকৃষ্ট।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, আল্লাহর উপর দৃঢ় ও গভীর বিশ্বাস ও ভয়ই হল বিচক্ষণতার উৎস। যারা আল্লাহকে ভয় করেন, তাঁর আদেশে ও নিষেধে মনোযোগী হন, তারা আল্লাহর আশীর্বাদ ও করুণায় স্বাভাবিকভাবেই এই উৎকৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টিখানির (Wisdom) অধিকারী হয়ে থাকেন। কিন্তু এই গুণটি সহজে অর্জন করা গেলেও অত্যন্ত কম লোকই বিচক্ষণতা গুণে ভূষিত হয়ে থাকেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর তায়ালা এই অবস্থাটি এভাবে বিবৃত করেছেন : **"তাদের বেশির ভাগই নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে না।"** [কোরআন : ৫ : ১০৩] প্রকৃতপক্ষে, যে বাস্তবতা থেকে এই অবস্থাটি জন্ম নেয় তাহল বেশির ভাগ লোকের জীবনে কোরআনের কোন স্থান না থাকায় তারা প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাসের অধিকারী থেকে পারে না।

> ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিল পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। [কুরআন : ৮:২৯]

যারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের জীবন পরিচালনা করেন, তাদেরকেই আল্লাহ বিচক্ষণতা গুণটি প্রদান করেন, যারই ফলে ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন। এই বিচক্ষণতা গুণটির মৌলিক উদাহরণগুলো হল ঃ

বিশ্বাসীদের এরূপ জ্ঞান যে, আল্লাহই সবসময় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যানুসারেই ঘটে থাকে, আর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তার সঙ্গেই বিদ্যমান রয়েছেন – এ ব্যাপারে ঈমানদার ব্যক্তির সচেতনাবোধ অত্যন্ত প্রবল। অধিকন্তু, বিচক্ষণতা গুণটি একজন বিশ্বাসীর বেলায় পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে তার নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতাকে সম্ভবপর করে তুলে।

বিশ্বাসীগণের অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেকের গভীরতা, তাদের মনোযোগ ও সচেতনাবোধ তাদের উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ নির্ভর ক্ষমতা, উত্তম নৈতিকতা, দৃঢ় চরিত্র এবং কথায় ও কাজে তাদের প্রাজ্ঞতা এসব কিছুই তাদের বিচক্ষণতার স্বাভাবিক ফল। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য হারুন ইয়াহিয়ার "True wisdom according to Quran" বইখানা দেখুন)।

ভেবে দেখুন, আমরা এতক্ষণ একটিমাত্র ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান যে অসাধারণ গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছি, তা যদি সমাজের সবারই থাকত! ভেবে দেখুন, সেই সমাজের উপর বয়ে আসা মঙ্গলের কথা, যে সমাজ এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হয়, যারা তাদের বলা প্রতিটি কথায়, প্রতিটি কাজে, তাদের নেয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তে এবং প্রতিটি সমস্যা যা সমাধানের চেষ্টায় রত তারা এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের বিবেচনা শক্তিকে কাজে লাগায়। ভেবে দেখুন সেই ধরনের পরিবেশের কথা, যা সেই সমাজেও বিদ্যমান থাকত – যদি সমাজটি বিচক্ষণ লোকদের নিয়ে গঠিত হত। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মনের শান্তি নিশ্চিত করার জন্যই আমাদের চারপাশে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বর্তমান থাকা অত্যন্ত জরুরী। তাছাড়া অরাজকতা, বিশৃংখলা আর

নৈরাজ্য ঠেকাতে আর এ ধরনের ব্যাপারগুলো থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এমন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের অস্তিত্ব থাকাটা অপরিহার্য। এ সবগুলো ব্যাপার বিবেচনায় আনলে এটা স্পষ্ট হয়ে আসে যে, প্রতিটি সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠিই হল বিচক্ষণতা দিয়ে সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনটি সনাক্ত করা বা বুঝতে পারা।

নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তি যেসব গুণাবলীর অধিকারী থেকে পারে, তাদের মাঝে বিচক্ষণতা গুণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রয়োগের মাধ্যমেই সেই ব্যক্তি অন্য যেকোন ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি পরিমাণে পরোপকার সাধন করতে পারে। কেননা, বিশ্বাস বা ঈমান যে নৈতিকতা বোধটি তার মাঝে ধীর ধীরে সঞ্চারিত করে তারই ফলে আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন লাভের চেয়ে বড় কোন লক্ষ্য তার থাকে না। এ ধরনের লোক তার সারাজীবন জুড়ে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত খাঁটি বিশ্বাসীর গুণাবলী প্রদর্শন করে থাকে ; যেমন – সে নিপীড়িতকে রক্ষা করে, গৃহহীন, নিঃসঙ্গ আর দরিদ্র লোকদের দেখাশুনা করে, সে সুবিচারের সুষ্ঠু প্রয়োগের দায়িত্ব অনুভব করে এবং কেউ ক্ষুধার্ত থাকুক তা সে বরদাশত করতে পারে না। পবিত্র কোরআন থেকে যে শিক্ষা সে অর্জন করে, তার প্রজ্ঞা তার সেই শিক্ষাগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগে সাহায্য করে এবং তার মাঝে সামাজিক দায়-দায়িত্বের প্রতি সচেতনাবোধের বিকাশ ঘটায়। আমরা সবাই এ ধরনের লোকই খুঁজে বেড়াই, যারা সমস্যাবলীর সমাধান করতে গিয়ে, সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে, উপদেশ ও সুপারিশ প্রদানে এ সবকিছুর বেলায় তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগায় আর তাদের বলা কথায় ও তাদের লেখনীতে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করে। তাই এমন ধরনের লোকের কথা ও কার্যাবলী থেকে অধিকতর বেশি উপকার পাওয়ারই কথা।

একবার যদি আমরা বিচক্ষণতার গুরুত্ব বুঝতে পারি, তবে এর উল্টোটির ফলে যে বিপদের আশংকা হয় তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করাটাও কঠিন হবে না। সাধারণতঃ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের প্রতি এই বিপদ হুমকিস্বরূপ : সুতরাং প্রাজ্ঞতার অভাবে যে সমস্যাবলীর জন্ম নেয়, সেগুলো পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখাটা কাজের হবে। "বিচক্ষণতার" একটি বৃহত্তম অন্তরায় হল "আত্মিক দূষণ বা অবক্ষয়" (Spiritual Corruption) যার কথা আমরা বইটির পূর্ববর্তী পর্বগুলোতে উল্লেখ করেছি ঃ রোমান্টিকতা বা ভাবাবেগ প্রবণতা বলে যাকে অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়।

সাধারণ ভাবাবেগ বা ভাববিলাসিতা

প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা অর্জিত সত্য তথ্যাবলী অনুসারে কাজ না করে বরং আবেগের বশে কাজ করাকেই আমরা ভাবাবেগ বলে সংজ্ঞায়িত করেছি। ভাবাবেগ হল একটি আত্মিক রোগ যা নাস্তিক কিংবা পৌত্তলিক সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝেই সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যদিও তা সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত করার প্রবণতা দেখায়, কোন কোন লোক অন্যদের চেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। কোরআনের প্রতি যে ব্যক্তির কোন আগ্রহ নেই কিংবা ধর্মানুসারে যে জীবনযাপন করে না তার পক্ষে রোমান্টিকতার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় না।

দুঃখবোধ করা, নিরাশ হওয়া কিংবা নিজেকে দুর্ভাগ্যের শিকার বলে ভাবা এগুলো সে সকল লোকেরই বৈশিষ্ট্য যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে না। যাই হোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, একজনের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা, আশান্বিত থাকা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা

একমাত্র বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করলে অর্থাৎ কোরআনের নৈতিক শিক্ষার উপর কাজ করেই ভাবাবেগের মূল্যোৎপাটন করা যেতে পারে। যেমন, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, যে ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের জীবনকে গড়ে তুলে না তার পক্ষে তার মনকে কার্যকরী রূপে কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে উঠে না।

প্রকৃতপক্ষে; ভাবাবেগ একটি আত্মিক রোগ হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞ সমাজে কেউ "ভাল লোক" কিনা তা নির্ণয় করতে অত্যন্ত সাধারণভাবে ভাবাবেগকেই (Sentimentality) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা সমাজের অধিকাংশ উর্দিপরা, অজ্ঞ, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের এতদূর প্রভাবিত করে রেখেছে যে, কেউ যদি কোন রোমান্টিক অনুভূতি বা ভাবাবেগ দ্বারা সহজে আলোড়িত না হয় তবে

তাকে তৎক্ষণাৎই নির্দয় বা হৃদয়হীন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ভাবাবেগপ্রবণ মানুষ নিজেদের হতাশা ও বিষাদ হতে মুক্ত রাখতে পারে না। তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে

ভাবাবেগ কি এতই নিষ্পাপ ও নির্দোষ থেকে পারে, যেমনটি হওয়া উচিত বলে ভাবা হয় ? যদি আমরা এই প্রশ্নটির দিকে দৃষ্টিপাত করে বাস্তব সম্মতভাবে এর উত্তর প্রদান করি তবে আমরা যে সত্যটুকু আবিষ্কার করব তাহল আবেগ-প্রবণতা কিছু মারাত্মক পরিণতির জন্ম দেয়। এই বইটির পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতার সাধারণ প্রভাব দেখেছি, কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এর বড় ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। বহু বিষয় রয়েছে যেক্ষেত্রে বহুলোক সমাধান খুঁজতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায় ও ফলে তার মুখ থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয় – এ সবকিছুর অন্যতম প্রধান কারণ হল সাধারণ ভাবাবেগ।

অবশ্য, যেহেতু প্রতিটি সমস্যার সমাধান আর প্রতিটি কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসার পথ পবিত্র কোরআনে উপস্থাপিত রয়েছে, সেহেতু যে ব্যক্তিবর্গ বা সমাজসমূহ কোরআনকে তাদের পথচালিকা হিসেবে ব্যবহার করবে, তারা বিচক্ষণতা কর্তৃক বয়ে আনা সব ধরনের সুবিধাদি ভোগ করবে। অন্য কথায় তারা বিচক্ষণতার সুফলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জীবন-যাপন করবেন ঃ

> "------- তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর তরফ থেকে এক জ্যোতি ও একটি সমুজ্জ্বল কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে স্বীয় অনুমতি ক্রমে, আর তাদের তিনি পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। [কোরআন : ৫ : ১৫-১৬]

শৈশবকাল থেকেই আমরা দেখে এসেছি যে মানুষ যেকোন কিছুতে কাঁদতে পারে। খবরের কাগজে কোন অন্যায়-অবিচারের ঘটনা পড়ে, টেলিভিশনে ক্ষুধার্ত মানুষের ছবি দেখে সে কাঁদে। আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে অন্যের জন্য দুঃখ

প্রকাশ করতে দেখি তখন তাকে সুবিবেক সম্পন্ন মানুষ বলে ধারণা করি, কিন্তু এ ধরনের আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া যদি কেবলই অশ্রুপাত ও দোষারোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতে কোন উপকার নেই। ভুক্তভোগীদের মঙ্গলের জন্য এ ধরনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া কোন ধরনের সক্রিয় ও জড়িত আগ্রহ বা অনুরাগ প্রমাণ করে দেখায় না। এ ধরনের লোকেরা দুঃখী মানুষের জন্য কেঁদে ও দুঃখবোধ করেই আনন্দ পায় অথচ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কিছুই করে না। তারা অবচেতন মনে আনমনা এক ভাবাবেগময় অবস্থায় বাস করতেই অধিক পছন্দ করে। কৌতূহলের ব্যাপারটি হল, এ ধরনের লোক হতাশা, নৈরাশ্যবোধ, দুঃখ, মনমরা অবস্থা, বিষণ্নতা এবং অপরাপর সবধরনের নেতিবাচক উপলব্ধি দিয়েও তাড়িত হয়, যে অবস্থাদির মাঝে শয়তান ভাবাবেগের মাধ্যমে জগৎকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।

এই ব্যাপারে কখনও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করার বাকি রয়েছে ঃ যদি কেউ একজন তাদের এই উপদেশ দেয় টেলিভিশনের সামনে বসে কাঁদার পরিবর্তে তাদের উঠে দাঁড়িয়ে কিছু করা উচিত, তবে তাতে কোন কাজ হবে না। "সেখানে করার কি আছে ?" "আমি একা সেখানে কি করতে পারব ?" এ ধরনেরই কিছু অজুহাত তৈরি করে সে কেটে পড়তে চাইবে।

সমস্যাটির সমাধান খুবই জটিল এমন কথা বলে আবেগপ্রবণ লোক দুঃখবাদের আগমনে সাহায্যই করে, আর এটা তাদের সমভাবাপন্ন অন্যান্য লোকদেরও একই নৈরাশ্যবোধ গ্রহণে প্ররোচিত করে।

এটি কৌতূহলজনক যে, ভাবাবেগের মাধ্যমে শয়তান যাদের বিপথে নিয়ে গেছে তারা হতাশা, নৈরাশ্যবোধ, দুঃখ, শোক, আর বিষাদ এ ধরনের অসুস্থ অনুভূতির দিকে তাড়িত হয় বলেই মনে হয়। আল্লাহর উপর ভরসা করে জীবন-যাপন করলে যে শান্তি মেলে সে ধরনের জীবন-যাপন না করে তারা নিজেদের অবিরাম দুঃখের দিকে নিয়ে যেতে থাকে

ভাবাবেগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে অসংখ্য ভাল নৈতিক গুণাবলী এর সদগুণগুলো হারিয়ে ফেলে, এমনকি তা বিপজ্জনক মাত্রায়ও পৌছুতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সহমর্মিতা একটি নৈতিক গুণ যেটি কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উৎসাহিত করেছেন, কিন্তু একজন আবেগপ্রবণ লোক এটিরও অপব্যবহার করে, যে কিনা একজন অত্যাচারী শাসকের জন্য দু:খবোধ করতে পারে, তার কৃতকর্মের প্রশংসা করতে পারে এবং তার নিষ্ঠুরতাও সহ্য করতে পারে। অন্যদিকে একজন জ্ঞানী লোক ভাবাবেগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন মনোভাব, আচরণ কিংবা চিন্তার মাঝে সম্ভবত কোন প্রকার যথার্থতাই খুঁজে পাবে না। এর কারণ হল, যতক্ষণ এমন আবেগময় ধাত বা মেজাজ আত্মার মাঝে প্রতিপালিত থেকে থাকে, পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে এর অধিকতর ক্ষতিকর দিকট যেকোন সময় প্রকাশিত থেকে পারে।

এবার, স্পর্শকাতর (sensitive) এবং অন্যের আবেগানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া (empathetic) আর আবেগপ্রবণ (sentimental) হওয়ার মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা বের করে দেখা প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, স্পর্শকাতর, পরের আবেগানুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া ও ভদ্র হওয়া এগুলো এক ধরনের গুণ যা নবীগণের মাঝে উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বাসীগণ আবেগপ্রবণ না হয়ে পরদুঃখে দুখী ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। অন্য কথায় তারাই উৎকৃষ্ট বিচক্ষণতা সম্পন্ন মিতচারী বা সংযমী লোক যাদেরই মাঝে অত্যন্ত শক্তিশালী নৈতিক গুণাবলী বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তায়ালা নবী ইবরাহীম (আঃ) এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলেছেন : **"ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন বড় সহিষ্ণু, কোমল হৃদয় এবং সতত বা সর্বদা আল্লাহ পাকের অভিমুখী।"** [আল-কোরআন : ১ : ৭৫]

এটা ভুলে যাওয়া কখনও উচিত নয় যে, আবেগপ্রবণ লোক অন্যের জন্য কেবল করুণাই অনুভব করে, তাদেরকে কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার ব্যাপারে কিংবা তাদের সমস্যার সমাধানকল্পে তারা সাহায্য করার কোন প্রয়াস চালায় না। তবে, যার মাঝে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রশংসিত সহমর্মিতা গুণ বিদ্যমান রয়েছে, সে অন্যকে সাহায্য করতে কিংবা তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং তাকে দুঃখকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। আর এটাই হল সত্যিকার সহমর্মিতা ও ভালবাসা।

ভাবাবেগ কিভাবে প্রাজ্ঞতাকে আড়াল করে রাখে ?

প্রতিটি ব্যক্তিকেই ভালবাসা, সহমর্মিতা, দয়া এবং ভয় এসব অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এসব অনুভূতিগুলোর অধিকারী হওয়াটাই মানবিক। আমরা এখানে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই তা হল, প্রতিটি লোকের জন্য সুস্থ ও সুষম (Balanced) বা ভারসাম্যপূর্ণ আত্মিক জীবনের অধিকারী থেকে হলে তার আবেগকে সংযত রাখা এবং তার ঈমান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী নিজের আবেগকে পরিচালিত করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, "ভালবাসা" গুণটি মানুষকে এ কারণে প্রদান করা হয়েছে যেন সে সর্বাগ্রে সেই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা অনুভব ও প্রদর্শন করে, যিনি অস্তিত্বহীন (শূন্য) অবস্থা থেকে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের জীবিকা সরবরাহ করে থাকেন, যিনি আমাদের প্রতি প্রতিটি অনুগ্রহ প্রদান করেন এবং যিনি আমাদের জন্য একটি সুখময় অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছেন। ভালবাসা এমন একটি আবেগ যা এমন ঈমানদার লোকদের জন্য বা উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত – যারা আল্লাহকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ তায়ালাও যাদের ভালবাসেন। একজন ব্যক্তিকে ভালবাসা হয়, যথাক্রমে – আল্লাহর সঙ্গে তার নৈকট্য লাভের কারণে, তার আল্লাহ ভীতির কারণে আর আল্লাহর বিশেষ অধিকারগুলোর প্রতি সে যত্নবান – এসব কারণে। এ ধরণের ভালবাসা আল্লাহর উদ্দেশ্যে আর যে সকল বস্তুতে আল্লাহর গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে তাদেরও উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের শত্রুদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করাকে পবিত্র কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে।

অধিকন্তু, আল্লাহ ঈমানদারগণকে আদেশ করেছেন তাঁরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভয় না করেন, কেননা আল্লাহরই সার্বভৌমত্বের অধীনে রয়েছে প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তু। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্ত্বাই মানুষের ভয় অর্জন করার যোগ্য নয়।

> যারা ব্যয় করে সচ্ছল অবস্থায়ও এবং অসচ্ছল অবস্থায়ও আর তারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের অপরাধ ক্ষমাকারী। আল্লাহ নেককারদের ভালবাসেন।
> [আল-কোরআন : ৩ : ১৩৪]

ক্রোধের অনুভূতিকে আমরা পরবর্তী উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরব। ক্রোধ এমনি একটি আবেগ যা সঙ্গী লোকটির প্রতি একজন ঈমানদারের দায়িত্ব বোধকে জাগ্রত করে তুলে এবং অন্যায়, আল্লাহ ও তাঁর

ধর্মের শত্রু এবং নির্যাতন–এসবের বিরুদ্ধে বিশ্বাসীকে ব্যবস্থা গ্রহণে পরিচালিত করে। অবশ্য, একজন ঈমানদার যখন দায়িত্ববোধ সহকারে কাজ করে, তখন তার সেই কাজ বুদ্ধিমত্তা, সংযম ও ভাল নৈতিকতা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই করা হয়ে থাকে। একজন ঈমানদার কখনও অন্যায়ভাবে কিংবা নির্দয়ভাবে কিংবা প্রতিহিংসার বশে কাজ করে না কিংবা কোরআনে যেমন আদেশ রয়েছে সে অনুসারেই সে অবিচারের প্রতি উত্তরে অবিচার প্রদর্শন করে না।

অবশ্য, কোন ব্যক্তি যদি তার অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করে, তবে যখন সামান্য কোন কাজও তার নিয়মানুসারে না ঘটে, আর তার ইচ্ছানুসারে কোন ব্যাপার না ঘটে থাকে কিংবা সে যা চায় তা যদি কেউ না করে- তবে সে সহজেই উন্মত্ত হয়ে উঠে আর সে হঠাৎ রাগে অগ্নিশর্মাও হয়ে উঠতে পারে। তার আভ্যন্তরীণ রাগের কারণে তার বিচারবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি লোপ পায় এবং সে যেকোন মুহূর্তে যেকোন আবেগ তাড়িত কাজও করে ফেলতে পারে।

আমরা যেমন দেখেছি যে, **আল্লাহ মানুষকে যে আবেগগুলো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের উচিত সেগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করা।**

যে ব্যক্তির মন বিচারবুদ্ধিহীন এবং যে তার আবেগের স্রোতে ভেসে চলে সে সহজেই রাগান্বিত থেকে হিংসার জন্ম দিতে পারে, আর এমনকি সহিংসতার আশ্রয়ও নিতে পারে। অন্যদিকে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ঈমান থাকায় নিজের রাগ সংবরণ করতে পারে"– যেভাবে আল্লাহ আদেশ করেছেন সেভাবে, আর সবসময় মধ্যপন্থী সংযমী মনোভাব গ্রহণ করে

অন্যকথায়, আল্লাহর ইচ্ছানুরূপ নয় এমন কোন ভয়, বা ক্রোধ কিংবা কোন ধরনের ভালবাসা কোন মতেই মানুষের নিজের মাঝে লালন করা উচিত নয়। আর যদি সে তা করে তবে সে সেই পথ অনুসরণ করছে না যে পথে চলার আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন বরং সে সেই পথ অনুসরণ করছে – যে পথে তার আবেগ তাকে পরিচালিত করছে। এটা শিরক এর চেয়ে কম কিছু নয়।

মানুষের সহজাত অনুভূতিগুলো যখন প্রজ্ঞা দিয়ে পরিচালিত না হয় তখনই ভাবাবেগের ব্যাধি বাসা বাঁধে আর সাধারণতঃ তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা, কর্ম, চিন্তা ও অন্যান্য ব্যাপারে তাদের আচরণগুলোতে ভাবাবেগ আচমকা চড়াও থেকে পারে। এই যখন ব্যাপার হয় তখন মানুষ প্রজ্ঞার রাজ্য থেকে প্রস্থান গ্রহণ করে এবং আবেগজুলুমের জগতে প্রবেশ করে। এ ধরনের লোকের মাঝে আবেগ বুদ্ধিমত্তাকে প্রতিহত করে আর মনকে ঘোলাটে করে ফেলে।

পবিত্র কোরআনে মানুষকে যাচাই করার যে মাপকাঠিগুলো রয়েছে সেগুলো বিবেচনা না করেই তারা তাদের ভালবাসার ব্যক্তিটির প্রতি অতিমাত্রার

বেশির ভাগ আবেগপ্রবণ লোক এমনভাবে বসে থাকে যেন তাদের হাত-পা বাঁধা – এ বাস্তব দৃশ্যের সাক্ষী আমরা : কেবলমাত্র কেঁদে আর অভিযোগ করেই তারা যেন তৃপ্তি লাভ করে ; কিন্তু নিজেকে কিংবা অন্যদের পরিস্থিতি থেকে প্রশমিত করতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এ সকল লোকেরা নিজেদের জন্য এত গভীর করুণা অনুভব করে যে, তুচ্ছ যেকোন বিষয় নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে সমস্যা তৈরি করে

অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বামী বা স্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে ভয় করে চলে কিংবা তারা ক্রোধে উন্মত্তও থেকে পারে। অবশ্যই এ ধরনের আত্মিক অবস্থায় যেসব লোকেরা বিদ্যমান থাকে, তাদের আমরা আচরণে জ্ঞানী হবে বলে আশা করব না, কেননা এমন লোকের বেলায় প্রজ্ঞা সীমাহীন আবেগ দিয়ে অপসারিত হয়।

ভাবাবেগ একজন ব্যক্তির বাস্তবতা বোধকে কেড়ে নেয়। আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বলার মত লক্ষণ হল যে, সে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জগতে বাস করার আশংকা রাখে। সে যেন স্বপ্ন জগতে বর্তমান একজন লোকের মত বাস্ত বতার সঙ্গে যার একটি ক্ষীণ যোগাযোগ রয়েছে। বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির পরিবর্তে আবেগ, স্বপ্ন ও অলীক কল্পনাকে সে বেছে নেয়। সুতরাং তার সঙ্গে আলোচনা কিংবা তর্কে লিপ্ত হওয়াটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সে না পারে কাউকে পথ দেখাতে, না পারে কারো উপদেশ গ্রহণ করতে।

বাস্তবে মানসিক রোগের একটি মৃদু বহিঃপ্রকাশ-মনস্তত্ত্ববিদগণ যাকে বলে থাকেন "সিজোফ্রেনিয়া" বা "ভগ্নমনস্কতা"। (যারা সিজোফ্রেনিয়ায় ভোগে তারা বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব ভুবনে বসবাস করে।)

টেলিভিশনে সিনেমার দৃশ্য দেখে ক্রন্দনরত একজন ব্যক্তির সঙ্গে একজন আবেগপূর্ণ লোকের তুলনা করা যেতে পারে ঃ দর্শক ব্যক্তিটি বাস্তব জগত থেকে এত দূরে চলে যায় যে, সে সিনেমায় কষ্ট করছে এমন এক অভিনেতার জন্য দুঃখবোধ করে, এমনকি ক্রন্দনও করে। অথচ এই অভিনেতা কি-না সিনেমায় অভিনয়ের বিনিময়ে পয়সা পাচ্ছে, আর তার বাস্তব জীবন হয়ত সব ধরনের নৈতিক অবক্ষয়ের আচরণে পূর্ণ। একজন প্রাজ্ঞ লোক কখনও এমনিতর অবস্থায় পতিত হবে না, আর এ অবস্থাটি পরিষ্কারভাবে এটাই প্রদর্শন করছে যে, ভাবাবেগপ্রবণ মানসিকতা একজন লোককে বাস্তব জগত থেকে কতদূর বিচ্ছিন্ন করতে পারে আর তাকে কতদূর অসুস্থ চিন্তাভাবনার দিকে ঠেলে দিতে পারে, ফলস্বরূপ সেগুলো তার প্রাত্যহিক জীবনে পালাক্রমে প্রতিফলিত হয়।

বেশির ভাগ আবেগপ্রবণ লোকই এমনভাবে বসে থাকে যেন তাদের হাত-পা বাঁধা – এ বাস্তব দৃশ্যটির সাক্ষী আমরা। তারা কেঁদে কেটে আর অভিযোগ করেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের যে বিরাগ রয়েছে তার মোকাবেলায় তারা কিছুই করে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন আত্মীয়ের দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সংবাদ এসেছে ; এর মাঝে কোন ভাল দিক রয়েছে

কি-না তা না ভেবে আর সে কিভাবে এ পরিস্থিতিতে কাজে আসতে ও সাহায্য করতে পারে সেটি ভাবার পরিবর্তে একজন আবেগপূর্ণ লোক সচরাচর মূর্ছা যাবে এবং কান্না শুরু করে দিবে। দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তির জন্য কি করা হয়েছে, তার জন্য ডাক্তার ডাকা হয়েছে কি-না এসব কোন খবরই সে নেবে না। সাহায্যের জন্য সে কি করতে পারে – সে পথ অন্বেষণ করবে না সে বরং নিজেকে শান্ত করার উপায় খুঁজে বেড়াবে যেন সেই একজন ব্যক্তি যার জন্যই আসলে সহযোগিতা দরকার।

কিংবা, তারই কাছাকাছি কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেল, এক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এম্বুলেন্স ডেকে আনার পরিবর্তে সে তার নির্বুদ্ধিতার কারণে চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করে আতংকের সৃষ্টি করে। কেউ যদি তাকে কি ঘটেছে তা জিজ্ঞেস করে, সে উত্তর দিতে সমর্থ হয় না, কেননা তার ভাবাবেগ তার বুদ্ধিকে ব্যবহারে বাধা প্রদান করে এবং তাকে অন্য লোকজনের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

কিংবা সে নিজেই কোন রোগে ভুগছে, সে জানে যে কিছু একটা অসুবিধা হয়েছে; কিন্তু ডাক্তারের কাছে গেলে রোগটি আরো ভয়াবহ রূপ নিবে – এ ভয়েই সে ভীত থাকে। সে অসুখী থেকে চায় না, সেজন্য চূড়ান্তভাবে রোগ নির্ণয় করতে সে উৎসাহী হয় না। রোগের চিকিৎসা না পেয়ে সে তার রোগমুক্তির সুযোগ হারায় যেখানে সে কিনা জ্ঞানীর মত কাজ করলে সুচিকিৎসা পেতে পারত।

কিভাবে এমন বিচারবুদ্ধিহীনতা ভয়ংকর ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনে – যা কিনা সময়ে সময়ে জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় – এ ধরনের পরিস্থিতি দেখাতে গিয়ে আমরা এমন অজ্ঞ ভাবাবেগপূর্ণ আচরণের অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারব। শয়তানের প্রভাবে এসব লোক তাদের চারধারে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে এত বিচ্ছিন্ন অনুভব করে যে তারা দুর্বল হয়ে যায়, তখন এ দেখে মনে হয় যেন তাদের নিজেদের জন্যই সাহায্য ও আশ্বাস পাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। অবশ্য, তারা যদি তাদের প্রজ্ঞার ব্যবহার করত আর তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাসমূহের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারত, তবেই তারা তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারত।

> নিশ্চয়ই তার (শয়তানের) কোন ক্ষমতা নেই তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় রবের উপর ভরসা রাখে। তার ক্ষমতাতো চলে কেবল তাদের উপর যারা তাকে অভিভাবক মনে করে এবং যারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে।
>
> [কোরআন : ১৬ : ৯৯-১০০]

আমরা দেখতে পাই যে, আবেগপ্রবণ লোকেরা সে ধরনের মানুষ নয়, যারা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তারা লোকজনের নেতৃত্ব দিতে পারে না। উল্টো, যেহেতু তাদের নিজেদেরই পরিচালিত হবার কিংবা যত্ন পাওয়ার দরকার হয়, সেজন্য তারা অন্যের বোঝায় পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ,

একজন আবেগপ্রবণ লোক যখন কাউকে অভাবগ্রস্ত দেখে, তখন তার দিকে সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে সে চিন্তা করে যে, কিভাবে দুঃখবোধ ছাড়া অন্য কিছু না করতে হয় এবং বলে, "সত্যি কি কষ্টের ব্যাপার।" কিংবা সে দয়া প্রদর্শনের অন্য কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়ে নেপথ্যে চলে যায়, আর এমন একজন লোকের কাছ থেকে ইতিবাচক কোন কিছুর আশা করাটাই ভুল।

এ ধরনের লোক আর ঈমানদারগণের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে তুলে ধরেছেন ঃ

> আল্লাহ আরও উদাহরণ বর্ণনা করেছেন দুই ব্যক্তির ঃ তাদের মধ্যে একজন বোবা, কোন কাজই করতে পারে না, তাই সে তার মনিবের গলগ্রহ ; মনিব তাকে যেখানেই পাঠায়, সে ভাল কিছু করতে পারে না ; সে কি ঐ ব্যক্তির সমান থেকে পারে যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং সরল পথে রয়েছে ?
>
> [কোরআন : ১৬ : ৭৬]

ভাববিলাসী লোকের একটি পরিষ্কার বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়- তার সমাধান তারা খুঁজে পেতে পারে না। বরং তারা নিরাশার পথ বেছে নেয়। অন্যদিকে যারা তাদের আবেগ দিয়ে কাজ না করে, বিচারবুদ্ধি দিয়ে কাজ করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তারা নানা ধরনের অসাধারণ ও সঠিক সমাধানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়

ঈমানদারগণ কোন বিষয়ে তাদের আবেগ অনুসারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, বরং তাদের প্রজ্ঞার মাধ্যমে শান্ত থাকেন আর উপরের আয়াতে যেমন বলা হয়েছে তেমনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে "ন্যায়ের আদেশ দেন" অর্থাৎ কোন ব্যাপারে যথার্থ ও সঠিক জিনিসটি সম্পন্ন হল কি-না তারা সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। যেহেতু তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের জীবনে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা আল্লাহর আদেশেই ঘটে থাকে, আর আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু চান তাছাড়া অন্য কিছু সম্পন্ন করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তারা কখনো সেই সংযমবোধ হারিয়ে বসেন না যে সংযম বোধখানা আল্লাহর কাছে তাদের আত্মসমর্পণ ও তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস থেকে এসে থাকে। তারা কখনো তাড়াহুড়ো করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না আর কখনও নৈরাশ্যবোধ ও হতাশার কাছে বশীভূত হন না। তারা জানেন যে, এমনকি প্রতিকূল অবস্থা থেকেও আল্লাহ তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

ভাবপ্রবণতা যে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় – এটি যদি আপনি কাউকে অবহিত করতে চাইতেন তবে সে আপনার কথায় কর্ণপাত করত না ; এমনকি শুরু থেকেই সে এমন একটি সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে অস্বীকার করত। আবেগপ্রবণ মানুষের মন যেকোন বিপরীত পরামর্শের প্রতি এমনি অবরুদ্ধ থাকে যে, সে সাথে সাথেই (পরামর্শদানের) অনুভব করে যে, তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আর হয় সে নিজের মনে কষ্টবোধ করবে এবং কান্না শুরু করবে কিংবা সে রাগান্বিত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিবে। সুতরাং আপনি কোন আবেগপ্রবণ ব্যক্তির সমালোচনা করতে পারবেন না, পরামর্শ বা উপদেশ দান তো দূরের কথা।

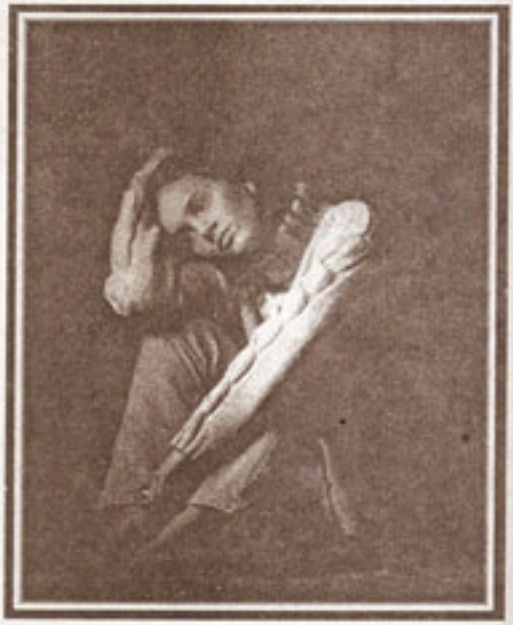

আবেগপ্রবণতা সহজেই মানুষকে কষ্টে ফেলে দেয়। ফলে, এ সকল মানুষকে কিছু বলা হলে সেসব কথার প্রতিটিরই একটি গুপ্ত অর্থ রয়েছে বলে তারা ভয় পায়, তারা সহজেই অপব্যাখ্যা করে কিংবা অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলে। তারপর, এর প্রতিবাদস্বরূপ এবং কোন রকম ব্যাখ্য ছাড়াই তারা কথা বলা বন্ধ করে দেয়, নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং বাচ্চাদের ন্যায় ঠোঁট ফুলিয়ে বসে থাকে। কারণ তারা হয়ত

যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে অসমর্থ ; নয়ত বাস্তবের মুখোমুখি থেকে ভয় পায় ; সেজন্য তাদের পক্ষে আত্মসমালোচনা করা কিংবা তাদের নিজেদের ভুল থেকে উন্নীত করে তোলাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এইমাত্র যেমন উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা হয় তাদের প্রতি উচ্চারিত কথার প্রতিটি শব্দকে অবিচার বলে ব্যাখ্যা করে এবং রাগান্বিত হয়, যারই ফলে তারা হতাশ হয়ে নিজেদেরকে নিজেদের মাঝে গুটিয়ে নেয়। যে ধরনের লোকেরা নিজেদের জন্য অসুখী হওয়াকেই বেছে নেয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন ঃ

সে উপদেশ গ্রহণ করবে যে আল্লাহকে ভয় করে, এবং সে তা উপেক্ষা করবে, যে অতিশয় হতভাগা। [কোরআন : ৮৭ : ১০-১১]

আর হে রাসূল! আপনার প্রতি ও পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতিও অবশ্যই একথা ওহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত কর তবে তোমার কর্ম অবশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল। বরং আল্লাহরই ইবাদত কর এবং শোকরগুজারদের শামিল হয়ে থাক। [কোরআন : ৩৯ : ৬৫-৬৬]

নিজেদের বিচারবুদ্ধি কাজে না লাগানো ঃ ফলে এবং তাদের নিজেদের আবেগের অনুশাসন অনুসরণ করার ফলে এসব লোক দিনের পর দিন তাদের প্রজ্ঞাকে অধিক থেকে অধিকতর ঘোলাটে করে ফেলে। যদি তারা তাদের এ অবস্থার শুদ্ধি না ঘটায় তবে তারা সম্ভবতঃ ধর্মের মূলভাব কল্পনাও করতে পারবে না, কিংবা এর নীতিমালা অনুসারে নিজেদের জীবন-যাপন করতে পারবে না। প্রজ্ঞাবিহীন একজন আবেগপ্রবণ লোক কখনও সুস্থ মতামত কিংবা সুস্থির ও সঙ্গতিপূর্ণ মনের অধিকারী থেকে পারে না। যে ব্যাপারটি একজন বিশ্বাসীর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট, সেখানে একজন আবেগপ্রবণ লোক সে ব্যাপারটিতে অসঙ্গতি ও সন্দেহের সন্ধান পায়। শংকাগ্রস্তের ন্যায় সে সংগ্রামে রত থাকে। বিচক্ষণগণের জন্য যে কোরআন একটি পথচালিকা, সেটি আবার আবেগপ্রবণ লোক বুঝতেই পারে না, সে কোরআন থেকে তাই উপদেশও গ্রহণ করতে পারে না।

আল্লাহকে যেমন সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা উচিত তেমনিভাবে সে মূল্যায়ন করতে পারে না এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা ঘটেছে তার নেপথ্যে যে প্রজ্ঞা রয়েছে তা সে বুঝতে পারে না ; বিশ্ব, বেহেশত ও দোযখের অস্তিত্বের পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে

শয়তান মানুষের মাঝে ভয়ের সঞ্চার করে সহজে তাকে বিপথে চালায়। সে তাদের আশাহত ও বেপরোয়া করে তোলে

সে তা ধারণা করতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই – এ কথাটির অর্থ কি তা সে বুঝতে পারে না। এমন একটি লোকের মনের প্রতিটি ধারণা, তার প্রতিটি চিন্তা, নিয়ত ও উদ্দেশ্য, তার প্রতিটি কর্ম তাকে এক ধরনের পৌত্তলিকতা বা শিরক থেকে অন্য আরেকটি শিরকেপূর্ণ কাজের দিকে ধাবিত করে।

মানব জাতিকে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে নিতে শয়তানের ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মাঝে এটিও একটি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এ ব্যাপারটি সতর্ক করে দিয়েছেন যে শয়তান তার নিয়ন্ত্রণাধীন যত উপায় রয়েছে তার যেকোনটি প্রয়োগ করে মানুষের দোযখে যাওয়ার পথ সুগম করবে।

> যাকে (শয়তানকে) আল্লাহ লা'নত করেন। আর সে বলে ঃ "আমি অবশ্যই তোমার বান্দাগণের মধ্য থেকে এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুগামী করে নেব এবং তাদের আমি পথভ্রষ্ট করবই, তাদের বৃথা আশ্বাস দেবই, আর আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দেব যেন তারা পশুর কান ছেদন করে, আর নিশ্চয় আমি তাদের নির্দেশ দেব যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি-বিকৃত করে দেয়।" আর যে কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে।

সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বৃথা আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। [কোরআন : ৪ : ১১৮-১২০]

যিনি এ আয়াতগুলো বুঝতে পারেন, তিনি – শয়তান তাকে মতিবিভ্রমে পরিচালিত করবে এমনটি থেকে দেন না। তিনি আবেগের জালে ধরা দেন না বরং বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে দেখার জন্য নিজের প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করেন এবং তারপর, তিনি যা দেখেন সে অনুসারে ন্যায়ের সঙ্গে কাজ করেন। যে ব্যক্তির মন আবেগে অস্বচ্ছ হয়ে আছে, তার কাছে যা কিছু গোলমেলে, বিপরীত এবং অস্পষ্ট – সেটিই আবার একজন ঈমানদার ব্যক্তির মনে স্বচ্ছ, পরিষ্কার এবং সহজ-সরল। অন্যদিকে, যারা হীনমন্যের ন্যায় ভাববিলাসিতায় পতিত হয়, তারা তাদের বিচারবুদ্ধিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে, শয়তানের খেয়াল ও খুশির কাছে নিজেদের সপে দিয়ে তারা ক্রমাগত পৌত্তলিকতা বা শিরকের হতাশাব্যঞ্জক, শীতল পাঁকের মধ্য দিয়ে অনন্ত শাস্তির দিকে পরিচালিত থেকে থাকে।

বিবিধ রোমান্টিকতা

আর যদি আমি মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত আস্বাদন করাই তারপর তা কেড়ে নেই, তাহলে সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

আর যদি আমি তাকে আস্বাদন করাই কোন নিয়ামত তার উপর আপতিত কোন দুঃখ-কষ্টের পরে তবে সে বলতে থাকে ঃ "আমার থেকে বিপদ-আপদ কেটে গেছে।" আর সে অহংকারী হয়ে পড়ে।

কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [কোরআন : ১১:৯-১১]

আবেগপ্রবণতা একজন মানুষের মনকে অবরুদ্ধ করে দেয় এবং তাকে শয়তানের সব ধরনের কূট-কৌশলের কাছে আক্রমণযোগ্য করে তুলে। শয়তান ভাবাবেগকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মবিহীন সমাজ ও ব্যক্তিকে তার (শয়তানের) যেমন ইচ্ছা তেমনতর সব ধরনের বিকৃতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ বইয়ের প্রথম পর্বে আমরা শয়তানের এরূপ কৌশলগুলোর কিছু উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। আর আমরা দেখেছি যে, রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ এবং কমিউনিজম এর মত ভাবাদর্শগুলো কিভাবে ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে ধর্মের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

আমাদের নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে বহু ধরনের ভাবপ্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী পাতাগুলোয় আমরা ভাবাবেগের মৌলিক শ্রেণীগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করব।

স্বভাবকটুতা (খিটখিটানি) ও দুঃখবাদ

এমন একটি স্বভাব দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা (স্বভাব) সৌন্দর্যের মাঝে আনন্দ খুঁজে পায় আর মানুষকে সুখে ও শান্তিতে বাস করার আকাংখা দিয়েও সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যেকোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার কিংবা সে পরিস্থিতিগুলোকে প্রীতিকর করে তোলার ইচ্ছা থাকা মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, কলহমুক্ত মন ও স্বাস্থ্যকর উদ্যম বা স্পিরিট কেবলমাত্র মনের স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, দেহের জন্যও অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। তথাপি, মানুষ যখন কোরআনের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ না করে তাদের অনুভব আকাংখা ও তীব্র ঝোঁকের বশে কাজ করে তখন সে দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও ভয়ে পীড়িত হয়। অদৃষ্টের প্রকৃতি বা ধরন সম্পর্কে কারো কোন প্রকার জ্ঞান বা ধারণা যদি না থাকে, মানুষের জীবন আল্লাহর হাতে সমর্পণ করা এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষানুসারে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করা বলতে কি বুঝায় – তা যদি মানুষ না জানে তবে সে এক প্রকার উদ্বেগের মাধ্যমে অবিরাম সংগ্রামরত অবস্থায় থাকে। যেকোন মুহূর্তে সে ব্যক্তির নিজের কিংবা তার ঘনিষ্ঠ কারো প্রতি কি ঘটবে তা না জানার ফলে এ ধরনের উদ্বেগে ভুগে থাকে সে ব্যক্তি। যেখানে, সে যদি আল্লাহ কর্তৃক মানুষের জন্য মনোনীত ধর্ম অনুযায়ী এবং

কোরআনের নৈতিক কানুন অনুসারে জীবন-যাপন করে – তবে সে কখনও এ ধরনের উদ্বেগ কিংবা অন্য কোন ধরনের কষ্ট ভোগ করবে না। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে এ সত্যটুকু প্রকাশ করেছেন, নবী বলেন ঃ

---------- তবে যে আমার হেদায়াত মেনে চলবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং সে কষ্টও পাবে না।

আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত----------। [কোরআন : ২০ : ১২৩-২৪]

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে, বহু লোক আল্লাহর তাগিদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফলস্বরূপ, তারা উদ্বেগপূর্ণ ও অসুখী জীবন-যাপন করে। অধিকন্তু, জীবন দৈব ঘটনা (Chance) দ্বারা পরিচালিত হয় এ অন্ধ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যেহেতু তারা জীবন-যাপন করে, সেহেতু, যে বিষয়গুলো তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বয়ে আনতে পারে সেগুলোকে তাদের বাধা ও দুর্ভাগ্য বলে ভেবে অনুতাপ করতে থাকে। খরচ হয়ে যাওয়ার কিংবা দরিদ্র হয়ে নিঃশেষ হওয়ার কিংবা প্রতারিত হওয়ার অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয়ে তাদের মন অবিরত বিচলিত থাকে। যখন তারা তোষামোদ পাওয়ার আকাংখা করে, তখনই আবার উপহাসের পাত্র হবার ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকে, যখন তারা আনুগত্য পাওয়ার আকাংখা করে, তখনই আবার অকৃতজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে থাকে ভীত। তারা যেকোন মুহূর্তে কোন দুঃসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনায় থাকে চিন্তিত কিংবা কেউ তাদের অপ্রীতিকর কোন কিছু বলতে বা করতে পারে- তা ভেবে হতাশায় ভুগে। এমনকি তারা তাদের চরম সুখের মুহূর্তেও এ উদ্বেগে বাস করে যে, তারা এ মুহূর্তটুকু চিরকাল ধরে রাখতে পারবে না ; সত্যিই তাদের জীবন যেন একটি দুঃস্বপ্ন। কোরআনকে অবহেলা করে লোকেরা যে ধরনের উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় থাকে – তার বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা এভাবে দিয়েছেন ঃ

যাকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করতে চান তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান তার বক্ষকে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন। যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ তাদেরকে এরূপে লাঞ্ছিত করেন।

[কোরআন : ৬ : ১২৫]

যারা ধর্মবিহীন জীবন-যাপন করে তারা যে বিপ্লিত বোধ করে আর তাদের মনে শান্তি থাকে না – এটাই স্বাভাবিক, কেননা, তারা যেসব লোকের সাহচর্যে জীবন-যাপন করে তাদের মধ্যে কোরআনে উল্লিখিত নৈতিক গুণাবলী যেমন : ভালবাসা, সহমর্মিতা, দয়া, আত্মত্যাগ, আর বিনম্রতা বিদ্যমান থাকে না। মানুষ যেখানে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা না করে সাহায্য করে না, যেখানে লাভের আশায় বন্ধুত্ব চলে, যেখানে কারো অতি সামান্য ভুলের জন্য ক্রোধপূর্ণ প্রতি-উত্তর দেয়া হয় আর যেখানে প্রত্যেকে একে অন্যের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, তারা যা আসলেই চিন্তা করে, তা আলাপ করে না বা মুখে বলে না – এ ধরনের প্রবঞ্চনা ও অপকারে পূর্ণ সিস্টেম বা প্রথায় বাস করাই – একজন ভাবপ্রবণ (Sentimental) মানুষের অসুখী হওয়ার একটি কারণ।

যাই হোক, এমন একজন ব্যক্তি যদি তার পছন্দের কোন পরিবেশে বাস করত তবুও সেক্ষেত্রে কমই পরিবর্তন আসত। এমনকি যদি তাদের চারদিকে সুখী হওয়ার মত ঘটনাও ঘটে যেত। সেক্ষেত্রেও এমন আবেগপ্রবণ মানুষ সেগুলোকে নেতিবাচক ভঙ্গীতে দেখার চেষ্টা করত। কেননা তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি জিনিস এমন ভঙ্গীতে দেখার চেষ্টা করে যে, আবহাওয়া গরম কি ঠান্ডা, বর্ষণ মুখর কিংবা ঝড়ো, এতে তাদের কিছুই আসে যায় না, যাই ঘটুক না কেন সে তাকে অভিযোগ করার মত কিছুতে রূপ দিবে। এ ধরনের লোক প্রতিটি ব্যাপারে অসন্তুষ্টি বোধ করার ছল খুঁজে বেড়ায় – এসবের পাতা ভরা উদাহরণ আমরা দাঁড় করাতে পারব। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ যা বলেন, এটা তারই বহিঃপ্রকাশ : **"সুতরাং তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা অনেক কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।** [কোরআন : ৯ : ৮২] অপর একটি আয়াতে তিনি অবিশ্বাসীদের আচরণ সম্পর্কে আমাদেরকে এরূপে ব্যক্ত করেছেন ঃ **"যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।"** [কোরআন : ৭০ : ২০]

অবিশ্বাসী লোকদের অসুখী হওয়ার আরেকটি অপরিহার্য কারণ হল যে, তারা ঠিক যেভাবে আশা করে সেভাবে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন আবেগপ্রবণ মহিলা তার স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করে রাখে আর যখন সে স্বামীটির কাছ থেকে নিজের আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া না পায় তখন সে দারুণ হতাশ হয়ে যায়। সে বন্ধুকে উপহার দেয়ার জন্য

টাকা জমায় কিন্তু আবার সে এ ভেবে দুঃখবোধ করে যে – তার বন্ধু উপহারখানা পেয়ে সেরূপ খুশী হয়নি যেরূপটি সে আশা করেছিল। সে একটা বাড়ি কিনে কিন্তু এটি ভেবে আবার সে মন খারাপ করে যে, রংওয়ালা ঠিকমত রংগুলো মেশাতে পারেনি। আসলে অসুখী হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলোর অন্ত নেই। প্রিয় কোন ফুটবল টীমের পরাজয়, পরীক্ষায় আশাকৃত ফলাফলের চেয়ে কম পয়েন্ট পাওয়া, কাজে (চাকুরীস্থলে) বিলম্বে পৌছা, ট্রাফিক জ্যাম, একজোড়া গ্লাস ভেঙ্গে যাওয়া, একখানা ঘড়ি হারিয়ে ফেলা, পার্টিতে কোন প্রিয় ড্রেস বা স্যুটে দাগ লেগে যাওয়া – এগুলো যে কোনটিই অখুশী হওয়ার ওজর থেকে পারে।

যে ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিকে ভাসা ভাসা যাচাই করে আর তাতে আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখায়, সে আগাম জানতে পারে না যে, যা কিছু তার ক্ষেত্রে ঘটার কথা তা পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে তার জন্য কল্যাণকর কোন কিছু হিসেবে ঘটতে পারে ? যেমন ধরুন, কোন এক ব্যক্তি বাস ধরতে না পেরে হতাশ হল, কিভাবে সে জানে যে মুহূর্ত পরে বাসটি দুর্ঘটনায় পতিত হবে না ? হয়ত আল্লাহ তার বাস ধরতে না পারার ঘটনাটি তার অদৃষ্টের একটি অংশ হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন যেন সে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যেতে পারে। চলুন, আমরা আরেকটি উদাহরণ বিবেচনা করে দেখি ঃ একজন ড্রাইভার তার চির পরিচিত বহির্গমনের পথটি না ধরে ভুল রাস্তায় চলে গেল। তার জ্ঞানের ভাসা ভাসা স্তর থেকে পরিস্থিতিটি বিবেচনা করে সে নিজের উপর রাগ করে বসল, তাকে আরো অধিক পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে হবে ভেবে তার আনন্দটাই উবে গেল। কিন্তু আসলে আল্লাহ তায়ালাই তাকে ভুল রাস্তায় চালিত করেছেন; অন্যান্য প্রতিটি ঘটনার ন্যায় এটাও ছিল তার নিয়তি।

তারপর আবার একজন অজ্ঞ লোকের বেলায় মনের মত একখানা চাকুরী না পাওয়াটাও নিজেকে দুর্ভাগা মনে করে বিষন্ন হওয়ার একটি কারণ। এমন একজন লোক চাকুরী পাওয়াটাকেই তার জীবনের জন্য নিশ্চিতভাবে একটি উত্তম ব্যাপার বলে বিবেচনা করে আর সেটি না পাওয়াকে মারাত্মক ক্ষতি বলে ধরে নেয়, যেখানে অন্য আরেক ব্যক্তি যে কিনা আল্লাহকে তার বন্ধু ও রক্ষাকর্তা বলে বিশ্বাস করে, সে জানবে যে আল্লাহ তার মঙ্গলের জন্যই ফলাফল অনুমোদন করেছেন আর সে আনন্দপূর্ণ ও সন্তুষ্টচিত্তে সে ফলাফল মেনে নিবে। হয়ত চাকুরীর পরিবেশ তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারত,

হয়তবা তার জন্য আরেকটি বড় সুযোগ ঘটতে যাচ্ছে বলে এ চাকরিটি না নেয়াটাই তার জন্য জরুরী ছিল।

আর অবশেষে, হয়ত কোন ব্যক্তির ভোরে গাড়িতে চড়ার কথা কিন্তু গাড়িটি নষ্ট, কাজ করছিল না, তখন সে তার অজ্ঞতাবশে এটিকে একটি মারাত্মক দুর্ভাগ্য বলে বিবেচনা করবে, কিন্তু আসলে আল্লাহ তায়ালাই তার জন্য এ বিষয়টি এভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন আর এ পরিস্থিতি থেকে হয়ত কোন না কোন মঙ্গল আসবে বলে গাড়িটি কাজ করছিল না। এ পরিস্থিতিতে লোকটি হয়ত ঘটনার নেপথ্যে যে কারণ রয়েছে তা দেখতে পারে না, কিন্তু সে দেখুক বা নাই দেখুক, তাকে অবশ্যই আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

একজন আবেগপ্রবণ লোক তার সমস্ত দিন জুড়ে প্রতিটি ব্যাপার নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করে সহজে ভগ্নমনস্ক, উত্তেজিত ও অনুতপ্ত বোধ করে ; কেননা সেসব কিছুই দুর্ভাগ্য বলে ধরে নেয়

মানুষ যখন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু ঘটে থাকে, তবেই তাকে দুর্ভাগ্য বলে উল্লেখ করে, যেখানে ঘটনাটি এ বিশেষ পথে ঘটাটাই উত্তম ছিল কেন না এটা তার ভাগ্য কর্তৃক নির্ধারিত ছিল। তারা যাকে দুর্ভাগ্য বলে বিবেচনা করে হতাশবোধ করে – তার পিছনে যে কারণ রয়েছে তা যদি আল্লাহ তাদের দেখিয়ে দিতেন আর অন্যভাবে, যেসব বিষয় তাদের মন ভেঙ্গে দেয় কিংবা তাদের উদ্বিগ্ন কিংবা রাগান্বিত করে তুলে – এ ঘটনাবলী থেকে পরবর্তীতে

যে মঙ্গল আসবে তা যদি আল্লাহ তাদের প্রদর্শন করতেন তবে তখন তারা বুঝতে পারত যে আগে শুধু শুধু দুঃখবোধ করে কিভাবে তারা বিপথে পরিচালিত হয়েছিল, আর তখনই তাদের অনুভবগুলো সুখ ও আনন্দে রূপান্তরিত হবে। যদি কোন ব্যক্তির নিয়তি অখণ্ডভাবে তাদের জানিয়ে দেয়া হত আর তথাকথিত দুর্ভাগ্যগুলোতে তারা যে ভূমিকা রেখেছিল তা যদি দেখিয়ে দেয়া হত – তবে তারা তাদের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর জন্য আবার কখনো অনুতপ্ত বোধ করত না।

সুতরাং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবন-যাপন করাটাই সবচেয়ে বিচক্ষণতার কাজ। যা হওয়ার কথা তাই হবে, এ কথা বলার বাকী রয়ে গিয়েছে যে, আসলে ইতিমধ্যে প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করেই বাস করছে – এ ব্যাপারটি কেউ বুঝুক বা না বুঝুক ; তবে এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই উচিত সচেতন থাকা। এ ধরনের সচেতনতাবোধ সম্পন্ন ঈমানদারগণ তাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের জটকে সেরূপ সন্তুষ্টচিত্তেই দেখতে পায়, যেরূপ মনে শান্তি নিয়ে মানুষ সিনেমা দেখতে বসে। আর তাই সেই মানুষটি মানসিক শান্তিসহ নিরাপদে জীবন-যাপন করে। তারা জানে যে, নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, **"অগাধ সম্পদে বিত্ত থাকে না, বরং বিত্ত রয়েছে আত্ম সন্তুষ্টির মাঝে।"**[১৩]

বেশির ভাগ লোকই মনে করে যে, জন্ম, মৃত্যু আর এর জন্য নির্ধারিত সময়, আর আল্লাহ মানুষের জন্য যে জীবিকা সরবরাহ করেন – সেগুলো ছাড়া অন্য সবকিছু ভাগ্য কর্তৃক নির্ধারিত হয় না ; তারা বিশ্বাস করে যে ব্যাপারগুলো দুর্ঘটনা বা অসাবধানতা থেকে ঘটে থাকে, সেগুলোর সঙ্গে ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে, মানুষের এ মতিবিভ্রম তাকে তার ভাগ্য কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলে আর এখানেই তাদের বিষাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ নিহিত রয়েছে। তারা প্রতিটি বিষয়কেই তাদের প্রতিবন্ধকতা বলে ভাবে, ফলে সেগুলো তাদের বিরামহীন যন্ত্রণায় ভুগাতে থাকে। তাই সেন্টিমেন্টাল লোকেরা যে সুখী ও আনন্দপূর্ণ মুহূর্তগুলো অনুভব করে সেগুলো হয় সংক্ষিপ্ত আর ক্ষণিকের। আর এক মুহূর্ত সুখ ভোগের পরই তারা যা কিছু দুঃখকর তা স্মরণ করাকেই বেছে নেয় ও বিষণ্ন করা হতাশবোধে তারা আবার ফিরে যায়।

এসব উপাদানগুলোই ধর্মবিহীন জীবন-যাপনের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল। ঈমান না থাকায় একজন মানুষ অনুতাপ ও হতাশার দাসে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, যারা আল্লাহর আদেশ কিংবা নিষেধের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তাদের জীবনের মুহূর্তগুলো অপচয় করে এ পৃথিবীতে অবহেলার সঙ্গে বাস করে তারা পরকালে কষ্টের সম্মুখীন হবে ঃ

> তারা বলবে ঃ **"হে আমার রব! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।"** [কোরআন : ২৩ : ১০৬]

এটা সত্য যে, আল্লাহ এ দুনিয়ায় কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন ; অবশ্য, ঈমানদারগণ এরূপ দুর্ভাবনার সম্মুখীন হলেও হতাশাবোধ ও নিরাশার কাছে আত্মসমর্পণ করে না – তারা আবেগের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। তিনি জানেন যে, আল্লাহ তাকে যাচাই করে নিচ্ছেন যে, তিনি প্রতিকূল পরিবেশে কেমন আচরন করবেন। আর এটাও জানেন যে, কেঁদে কেঁদে দুঃখ প্রকাশ ও অনুতাপ করার মাঝে কোন সমাধান নেই। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাঝেই নিহিত রয়েছে – সমাধান। **"অতঃপর তিনি যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন .....।"** [কোরআন : ৬৭ : ৬২] কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করার মাঝে আর আল্লাহ তার প্রার্থনা শুনবেন ও তার অনুরোধ মঞ্জুর করবেন – এতে নিশ্চিত বিশ্বাস করার মাঝেই রয়েছে সমস্যার সমাধান। এটা বান্দার কাছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

> **"জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথার কোন হেরফের হয় না। এটাই মহাসাফল্য।"** [কোরআন : ১০ : ৬২-৬৪]

অধিকন্তু এ ধরনের উদ্বেগ ও অসুবিধায় পূর্ণ যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তগুলো আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোন কারণে তৈরি করে রাখেন। যখন কেউ বিশ্বাসের চোখে তাকায় আর আল্লাহ যে সৌন্দর্যগুলো তৈরি করেছেন তার নেপথ্যে যে কারণসমূহ বিদ্যমান তা যদি সে দেখে, তখন সে সমবেদনা দিয়ে চালিত হবে এবং তার সন্তুষ্টি আরো বেড়ে যাবে। তাই, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের বিষয়টি আত্মার জন্য একটি সান্ত্বনাবোধ নিয়ে আসে এবং মানুষকে মনে শান্তিসহ জীবন-যাপন করতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, আবেগপ্রবণতা, মানুষকে আল্লাহর আয়ত্তাধীন থাকার চেতনাকে পুরোপুরি দূরে ঠেলে দেয় এবং পরিস্থিতির ভিন্নতায় অতি আনন্দে কিংবা গভীর দুঃখ ও বেদনায় তারা সহজেই কাতর হয়ে পড়ে। এসব লোকের হতাশা আর ঔদ্ধত্যের মাঝে দোদুল্যমান এ অবস্থার কথা এবং তাদের সাথে বিশ্বাসীদের যে পার্থক্য রয়েছে তাও আল্লাহ কোরআনে ব্যক্ত করেছেন ঃ

> আর যদি আমি মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত আস্বাদন করাই তারপর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেই, তাহলে সে অবশ্য হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।
>
> আর যদি আমি তাকে আস্বাদন করাই কোন নেয়ামত তার উপর আপতিত কোন দুঃখ-কষ্টের পরে, তবে সে তখন বলতে থাকে ঃ "আমার থেকে বিপদ-আপদ কেটে গেছে।" আর সে আনন্দিত ও অহংকারী হয়ে পড়ে।
>
> কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [কোরআন : ১১ : ৯-১১]

ক্রোধ আর ক্রুদ্ধ আচরণ

বেশির ভাগ সময়ই নারীদের মাঝে ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটে বিষণ্নতা, হতাশবোধ, কান্না আর বিলাপরূপে, যেখানে পুরুষের বেলায় সচরাচর তা ক্রোধ, স্বভাবকোপিতা (Irascibility) ও আগ্রাসন রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন, একজন আবেগপ্রবণ লোক যখন দেখবে তার গাড়ি পার্ক করার নির্দিষ্ট জায়গাটি অন্য কেউ দখল করে নিয়েছে তখন সে চেঁচামেচি করে সেই অবাঞ্ছিত গাড়ির গায়ে লাথি মারবেই। অথবা ফুটপাথ দিয়ে পথ চলতে চলতে যদি ভুলক্রমেও কারো সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে যায়, অতি সহজেই তখন তার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কিংবা কখনও তার ছেলে কিংবা মেয়েটি যদি ভুল করে চাবিটি বাড়ির ভিতরে রেখেই বাইরে বেরিয়ে যায়, ওয়েটার যদি খাবারের বিলটি আনতে একটু দেরি করে, অথবা যদি সেক্রেটারী টেলিফোনের জন্য অপেক্ষায় রাখে, যদি যানবাহনে চলতে গিয়ে কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে বিরক্তিবোধ হয় – তখন সে যাই মুখে আসে বলে ফেলে। সমস্যার মুখোমুখি হলে একজন বিবেকবান মানুষ তার মনের মাঝে খুঁটিনাটি শত বিষয় স্থান না দিয়েই সমস্যাটি খুব সহজেই অতিক্রম করে যেতে

পারেন। সেখানে একজন আবেগপ্রবণ লোক তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অতিরঞ্জিত করে। বেশির ভাগ সময়ে সে কেবল নিজেরই ক্ষতি সাধন করে আর বিষয়টির ইতি টানে অপমানিত হয়ে।

আবেগ প্রবণতা (Emotionalism) পুরুষের মাঝে ক্রোধ ও রুষ্ট আচরণের (Irascibility) রূপ নেয় আর এগুলোই "কঠিন পুরুষ" (Tough-guy) কিংবা পুরুষালী (Macho) গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ মানসিকতাটি হল ক্রোধ আর রোমান্টিকতার মিলিত একটি রূপমাত্র। এটি দ্বারা প্রভাবিত বেশির ভাগ লোকেরাই ভারসাম্যহীন এবং তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ার কিংবা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। এক মুহূর্তের অপরিণামদর্শিতার কারণে তারা কাউকে আঘাত করতে পারে, এমনকি খুনও করতে পারে ; সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ব্যক্তিও থেকে পারে তাদের জিঘাংসার শিকার। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এসব লোকগুলোর হাতে সংঘটিত অপরাধের খবর, আর তাদের নিয়ম লংঘনের সংবাদ দিয়েই ভরা থাকে।

হয়ত একটি সন্ধ্যা শুরু হল মনোরমভাবে, কিন্তু সহসাই এ মনোরম পরিবেশটির অবসান ঘটতে পারে যদি একজন আবেগপ্রবণ মানুষ রেগে গিয়ে তার বন্ধুকে কিংবা নিকটস্থ কাউকে আঘাত করে বসে। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে সে তার হাতে একটি ছুরি রাখে একজন অচেনা মানুষকে ছুরি মেরে বসে, যার অপরাধটি ছিল সে ফুটপাত থেকে তার দিকে তাকিয়েছিল। এক মিনিটের আবেগের বশবর্তী হয়ে বাকি জীবন কারাগারে কাটিয়ে শেষ করে। সবচেয়ে

একজন মাথাগরম লোক তার রাগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়, সে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, চেঁচামেচি করে কিংবা অন্যদের আহত করে, এটা স্পষ্ট যে বিচার-বুদ্ধি নয় বরং আবেগ দিয়ে তার মেজাজ প্রয়োচিত হয়

বড় কথা, যদি ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে সে হত্যা করে, কিংবা কারো ক্ষতি করে তবে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ করে থাকবে।

কোন ব্যক্তির মাঝে ক্রোধান্ধ আবেগপ্রবণতা হল একটি সুপ্ত বিপদ যা বিস্ফোরণের আকারে যেকোন সময় বেরিয়ে আসতে পারে আর তার প্রতিক্রিয়া হয় খুবই ভয়ংকর। একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি রেগে যেতে পারে যদি তার চলার পথে অন্য কেউ তার সামনে চলে আসে অথবা কোন অচেনা লোক যদি তার দিকে এমনভাবে তাকায় যাতে সে অস্বস্তিবোধ করে, কিংবা অতি তুচ্ছ কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারণেও সে রেগে যেতে পারে, এরপর সে এমন কিছু কাজ করে যার ফলে সমস্ত ঝামেলা আর যন্ত্রণা তার নিজের উপরেই নেমে আসে।

আবেগপ্রবণতা থেকে উদ্ভূত অযৌক্তিকতার একটি পরিষ্কার উদাহরণ আমরা ফুটবল ম্যাচের পর ফুটবল ভক্তদের পাশবিক আচরণের মাঝে দেখতে পাই। তারা অচেনা লোকদের উপর হামলা করে বসে আর মাংস কাটার মুগুর, গদা, ছুরি দিয়ে এসব লোকদের মেরে মৃতপ্রায় করে ফেলে। তাদের মন ও বিবেক আবেগপ্রবণতা নামক এক শয়তানি অস্ত্র দিয়ে অন্ধ হয়ে থাকে যা কিনা এ সমাজের জন্য একটি মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ। কিন্তু আল্লাহ মানব জাতিকে আদেশ করেছেন শয়তানকে এড়িয়ে চলতে যাতে ক্রোধ ও দ্বন্দ্ব নয় বরং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

> **"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"**
>
> [কোরআন : ২ : ২০৮]

নবী মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বাসীদের মাঝে শান্তি প্রচার করেন এ বলে –

> **"শক্তিশালী সে নয় যে তার শক্তি দিয়ে মানুষকে পরাভূত করে, বরং সেই শক্তিশালী যে নিজেকে ক্রোধের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"**[১৪]

এখানে আবেগপ্রবণতা এবং যৌক্তিকতার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। নিষ্ঠুর কাজ ও অন্যায়ের প্রতি প্রতিউত্তরে যে রাগ ও ঘৃণার অনুভূতি জন্ম নেয় তা একজন মানুষকে সুবিচার, শান্তি আর কল্যাণের প্রতি আরো বেশি সংবেদনশীল ও সচেতন করে তোলে এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করে অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার মূলোৎপাটন করতে, নিষ্পাপ ও দুর্বলের অধিকার রক্ষা করতে। আল্লাহ মানুষকে যে ন্যায়বিচার বোধ দিয়েছেন তা যদি দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা

দিয়ে নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা এর মূল উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে, এবং ক্রোধের আগুন প্রতিপক্ষ দলের ভক্তদের বিরুদ্ধে ধপ করে জ্বলে উঠে। যাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রাজ্ঞতা নেই তারা তাদের আবেগকে সংযত করতে পারে না এবং সত্যিকারের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তানের নির্দেশিত পথে তারা পরিচালিত থেকে পারে। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ মানব জাতিকে শয়তানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছেন ঃ

"যারা ঈমান এনেছ শোন। তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না ও যে কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, শয়তান তো সবাইকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র থেকে পারত না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।

আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।" [কোরআন : ২৪ : ২১]

বিভিন্ন খেলা প্রতিযোগিতায় বিশেষ করে ফুটবল ম্যাচে সময় সময় বহুসংখ্যক দর্শক আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণভাবে অবিবেচকের মত কাজ করে। তারা সহজে রেগে যায়, কিংবা এমন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে যে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কখনও কখনও তাদের কাজকর্ম এতটাই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে যে তারা অন্যকে আঘাতও করে

সহমর্মিতার শয়তানি অর্থ
The Satanic Sense of Compassion

যারা শয়তানের কূট-কৌশলের প্রতি সদা সতর্ক না থাকে, তারা আল্লাহ যে অনুগ্রহ তাদের প্রতি করেছেন তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্তভাবে প্রয়োগ করে। যে দয়া আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী সে ধরনের দয়ার উদ্রেক হওয়াই হল দয়ার শয়তানি দিক বা বোধ। ভাবাবেগপ্রবণ মানুষ কোরআনকে দয়া ও ক্ষমার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ না করে বরং নিজের আবেগ তাড়নাকে প্রাধান্য দেয়, আর তারই ফলে এ অনুভূতিগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়।

যেমন কোন কোন মানুষ অন্যের কষ্টে, ছোট শিশুর মৃত্যুতে কিংবা ছোট্ট সুন্দর কোন প্রাণীর মৃত্যুতে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। কিন্তু এখানে দয়ার শয়তানি দিকটিই কাজ করে আর একজন মানুষকে তা করে তুলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং আল্লাহর প্রতি কটুক্তি করতে প্ররোচনা দেয় তাকে। অপরদিকে যে ব্যক্তি নিজেকে তা থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তার জ্ঞানকে ব্যবহার করবে, সে সত্যকে স্পষ্ট ও পবিত্ররূপে দেখতে পাবে। ছোট্ট শিশু বা বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য মৃত্যু কোন অসহনীয় ভীতি নয় ; এ হল তার জন্য এক মুক্তি আর অনন্ত সুন্দর জীবনে প্রবেশের একটি সোপান মাত্র। এটি হল সেই তোরণ বা দ্বার যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে আপন সান্নিধ্যে টেনে নেন। কিন্তু শয়তান আর তার বন্ধুদের বিবেচনায় মৃত্যু হল তাদের অসংযত ভোগ-লালসা ও আবেগের সমাপ্তি ; এ হল তাদের সে মুহূর্ত যখন তাদের সেই অনন্তকালের শাস্তির দুয়ার খুলে যায়, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতিই তাদের দেয়া হয়েছে। এ কারণে মৃত্যুকে শয়তান এক জঘন্য ও বীভৎস কোন কিছু হিসেবে বিবেচনা করে আর এভাবেই এটি উপস্থাপন করার প্রয়াস চালায়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে শয়তানের জন্য তা সত্য কিন্তু বিশ্বাসী ও পবিত্রদের জন্য তা তেমনটি নয়। দোযখের জন্য যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট হয়ে আছে মৃত্যু তার জন্য সত্যিই একটি মন্দ জিনিস ; কিন্তু যাদের স্থান হবে বেহেশতে তাদের জন্য এটি শুধুই একটি আনন্দের প্রতিশ্রুতি।

সহমর্মিতার শয়তানি ধারণা একজনের সহানুভূতিকে এমন এক পথে পরিচালিত করে, যা কোন কল্যাণ বয়ে তো আনেই না বরং অন্যের ক্ষতি সাধনই করে। পৌত্তলিক কিংবা নাস্তিক এক ব্যক্তি সব বিষয়েই এমনভাবে তাদের চোখ বন্ধ করে রাখে যে, কখনও তারা ভেবে দেখে না যে, তাদের

কাজগুলো মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে কি-না। যেমন, তারা অনৈতিকতাকে অনুমোদন করে এবং যখন তারা কাউকে এমন কিছু করতে দেখে যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তারা তখন নিশ্চুপ হয়ে থাকে ; প্রকৃতপক্ষে এমনকি তারা সে কাজে উৎসাহও দিতে পারে। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল ঃ একটি শিশুর মাতা-পিতা, তাদের বাচ্চাটির বয়স এমন যে সে রোজা রাখতে পারে ; কিন্তু মা-বাবা তাকে রোজা রাখার অনুমতি দেন না, কারণ তাদের ধারণা – তাদের সন্তান ক্ষিধে সইতে পারবে না। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, এমন একজন যে কিনা তার পরিবারের লোকদের সকালের নামাযের জন্য জাগিয়ে তুলতে পারে না। আসলে এসব মানুষের মাঝেই রয়েছে সহমর্মিতার শয়তানি ধারণা।

বিশ্বাসিগণ তাদের সহমর্মিতাকে সেভাবে অনুশীলন করেন যা তাদের পৃথিবীর পরের জীবনেও মঙ্গল বয়ে আনবে এবং এ ভিত্তিতেই তাদের সহানুভূতিকে পরিমাপ করে থাকেন। যখন অন্য কোন বিশ্বাসীকে তিনি ভালবাসেন তখন তার প্রতি সে ভালবাসা ও সহানুভূতির জন্য তাকে থেকে হয় সমালোচক, সে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য তাকে সংশোধন করতে হয়। কখনো কারো আচরণ যদি ঈমানদার ব্যক্তির কাছে আপত্তিকর মনে হয় তখন তিনি তাকে সমালোচনা করতে পারেন। তিনি চেষ্টা করেন তাকে তার পথ থেকে সরিয়ে আনতে অথবা তিনি তাকে অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন যেহেতু কোরআনে এরই আদেশ করা হয়েছে। এটাই তো আসল সহমর্মিতা। এসব কথা যখন একজন ঈমানদার বলেন তখন তার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে যেন অন্যেরা তার কথাকে গুরুত্ব সহকারে তাদের মনে স্থান দেয় এবং সে যেন কোরআন পরিপন্থী এমন কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকে। তিনি চান না পরকালে কেউ দোযখের শাস্তি ভোগ করুক, যেখান থেকে ফিরে আসার কোনই পথ নেই। এজন্যই তিনি তাকে সেরূপ নৈতিকতাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে উৎসাহ দেবেন যে ধারার জীবন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ; এভাবেই তিনি তাকে বেহেশতের বাসিন্দা করে গড়ে তলবেন ; আর তা করতে গিয়ে তিনি আসলে সম্ভাব্য মহোত্তম সহানুভূতির বশে কাজ করতে থাকবেন। এটা ভুলে যাওয়া অবশ্যই উচিত হবে না যে দয়ার আসল অভাব তখনই হয় যখন কেউ অন্য কাউকে অন্যায় কাজ করছে দেখেও নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকে ; কখনও তা ভেবে দেখে না যে পরকালে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে।

শয়তানি সহমর্মিতা অবিচারের সঙ্গে হাতে হাত রেখে পাশাপাশি চলে।

একজন জ্ঞানী ঈমানদার ব্যক্তি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সুবিচার ও আল্লাহর ইচ্ছার দিকে খেয়াল করে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ; সেখানে যে ব্যক্তি দুঃখ ও সহানুভূতির শয়তানি অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে সে অনেকটা অন্যায়ভাবে কাজ করার প্রবণতা দেখায়। সে তার হীন মনোবৃত্তি, তার অনুভূতি, তার আকাংখা ও আবেগের অনুশাসনে পরিচালিত হয়ে কাজ করে। যখন সে কোন ঘটনা অবলোকন করে তখন সে কে সঠিক আর কে বেঠিক তা না জেনে, ন্যায্য ও সঠিকভাবে যাচাই না করে আর সবচেয়ে বড় কথা হল কোরআনের আদেশাবলী বিবেচনা না করেই সে দয়া প্রদর্শন করে। সাধারণতঃ সে তার ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়াগুলো দিয়ে নিজেকে ও অন্যান্যদেরকে ক্ষতিকর উদ্যোগসমূহে লিপ্ত করে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে আসে যে, সে যে সহমর্মিতা অনুভব করে তা কোরআনে আদিষ্ট নৈতিক গুণাবলী থেকে অনেক অনেক দূরে।

একজন আবেগপ্রবণ লোকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল স্বার্থপরতা। বাইরে থেকে এদের কাজ দেখলে মনে হয় তারা আত্মোৎসর্গ ও উদ্যমের সঙ্গে কাজ করছে কিন্তু আসলে তাদের কাজ তারা করে শুধুই আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে। এ কারণেই আমরা আবেগপ্রবণ কোন মানুষকে ন্যায়বিচার ও সাম্য বোধ বজায় রেখে কাজ করছে বলে আশা করতে পারি না। যখন কেউ নিজেকে এমন কোন পরিস্থিতির মাঝে দেখতে পায় যা তার নিজ স্বার্থের পরিপন্থী কিংবা তার কোন আত্মীয় বা তার ভালবাসার মানুষটির স্বার্থের বিরোধী তখন সে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করার পরিবর্তে অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়। যখন তাকে কোন কিছু বিবেচনা করতে বলা হয় তখন সে হয়ত এমনকি তার কোন আত্মীয় বা বন্ধুর পক্ষেই কথা বলে, তখন তার মতামত সত্য নাও থেকে পারে, এমনকি সে মিথ্যা সাক্ষ্যও প্রদান করতে পারে। অন্যদিকে, একজন ঈমানদারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করা। আল-কোরআনে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই শুধুমাত্র আত্মীয় বা বন্ধুর প্রতিই নয় বরং যারা আমাদের শত্রু তাদের প্রতিও সুবিচারের আদেশ করেছেন ঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় ; হোক সে ধনী অথবা দরিদ্র, উভয়ের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক অধিকতর। অতএব ন্যায়বিচার করতে গিয়ে

> তোমরা কামনা-বাসনার অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর তার পরিপূর্ণ খবর রাখেন।" [কোরআন : ৪ : ১৩৫]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ মানবজাতিকে সুবিচারের সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদান করতে আহ্বান করেছেন ঃ

> "যারা ঈমান এনেছ শোন। তোমরা অবিচল থাকবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে, এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের কখনও প্ররোচিত না করে ন্যায়বিচার বর্জন করতে। ন্যায়বিচার করবে। ন্যায়বিচার করাই তাকওয়ার নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব খবর রাখেন সে বিষয়ে যা তোমরা কর।" [কোরআন : ৫ : ৮]

যা হোক, আয়াতগুলোতে যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করা আবেগপ্রবণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এমন লোকের চরিত্রের মূলভিত্তি নিহিত থাকে স্বার্থপরতার মাঝে এবং তাদের রায় কখনই বস্তুনিষ্ঠ হবে না। প্রথমতঃ সে কাজ করবে নিজের স্বার্থের অনুকূলে, তারপর তার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের পক্ষে, তারপর সে কোন কারণ ছাড়াই যাদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেবে। সে অনৈতিকতা, এমনকি যে কাজগুলোকে অপরাধ বলে ধরা হয়, সেগুলোর প্রতিও চোখ বুজে থাকে।

কৃতজ্ঞতা বোধ
The Feeling of Gratitude

মানুষের মাঝে জোরালো যে আবেগগুলো রয়েছে তাদেরই একটি হল কৃতজ্ঞতা বোধ। একজন মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আশীর্বাদ ও করুণার অবিচ্ছিন্ন ধারায় সিক্ত হয়। যেহেতু এ দান বা আশীর্বাদের বেশির ভাগই একজন মানুষকে কোন না কোন উপায়ে গ্রহণ করতে হয়, তাই এ করুণার উৎসের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি পরিচালিত হয়। অবশ্য কোরআন বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। কোরআনে এ কৃতজ্ঞতা বোধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "ধন্যবাদ জ্ঞাপন" হিসেবে। এ ধন্যবাদ জ্ঞাপন বা শোকর গুজার করা বলতে তাই বুঝায় – উৎস যাই হোক

না কেন সকল দান ও আশীর্বাদ শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে এবং তিনিই এর একমাত্র সরবরাহকারী, এটাই হল আল্লাহর প্রতি আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শুকর গুজারের একমাত্র আন্তরিক অনুভূতি। কোরআনে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহকে ধন্যবাদ দেয়া ও কেবলমাত্র তারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হল প্রকৃত ইবাদতকারীর লক্ষণ।

তোমরা খাও সেসব জিনিস থেকে যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন হালাল ও পবিত্ররূপে এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গুজারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর। [কোরআন : ১৬ : ১১৪]

এ আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা থেকে এটি স্পষ্ট যে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, তাঁর কোন সৃষ্টিকে উপাসনার পর্যায়ে উপনীত না করাই হল প্রকৃত ইবাদতের লক্ষণ। আল্লাহকে শোকরিয়া জ্ঞাপনকারী একজন ব্যক্তি এ ব্যাপারে সচেতন থাকেন যেসব অনুগ্রহ কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে, প্রতিটি জিনিস তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নেই। সকল অনুগ্রহ কেবল আল্লাহরই তরফ থেকে আসে। এটা যে ব্যক্তি জেনে থাকেন, তার অন্তরে এ বিশ্বাসটিও দৃঢ়ভাবে থাকে যে, সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনিই হলেন একজন আদর্শ মানব যার কথা কোরআনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যারই প্রশংসা করা হয়েছে কোরআনে।

আবেগপ্রবণ মানুষ ঠিক এরই বিপরীত প্রবণতা দেখিয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদগুলো দান করেন, মানুষ সেই ব্যক্তি বা বস্তুকেই প্রাপ্ত দানের আঁধার বলে মনে করে আর এগুলোর প্রতিই তারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে থাকে ; আর এ মাধ্যমগুলোর কাছেই তারা সাহায্য প্রার্থনা করে। এদের প্রতিই তারা কৃতজ্ঞ থাকে। সংক্ষিপ্তভাবে, তারা তাদের নিজেদের জন্য অসংখ্য উপাস্য দাড় করায় – যাদের প্রতি তারা মিথ্যা দৈবশক্তি বা দেবত্ব আরোপ করে। কেননা, তাদের বিচক্ষণতাকে ব্যবহার না করায় তারা এটা দেখতে পায় না যে, যাদের তারা মিছে পূজা বা ভক্তি করে তাদের আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, আর তারা যা কিছু করে তা আসলে আল্লাহর মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়, আল্লাহর আদেশ ও ক্ষমতা ছাড়া কোন কিছুর করার ক্ষমতা তাদের নেই।

অপাত্রে স্থাপিত কৃতজ্ঞতা বোধই আবেগপ্রবণ মানুষের জন্য পরবর্তীতে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তির প্রতি, সংসারের বয়োজেষ্ঠ্যের প্রতি কিংবা ধনী আত্মীয়ের প্রতি নিজেদেরকে ছোট করাটাই তাদেরকে বিষণ্নতার দিকে ঠেলে দেয় ; আর এ বিষণ্নতা এমনি একটি অনুভূতি যা তাদের কথা ও কাজে প্রতিফলিত হয়। রোমান্টিকতা থেকে জন্ম নেয়া অসংখ্য উদ্বেগের মাঝে এ ধরনের আচরণ হল, একটি আর এ আচরণ ঈমানদারগণের জন্য বেমানান।

অন্তর্মুখিতা (Introversion)

ভাবাবেগপ্রবণতা কিছু কিছু লোকের মাঝে অন্তর্মুখিতার রূপ নেয় কিংবা অন্যান্য লোকের সঙ্গে যোগাযোগে অক্ষমতা হিসেবে দেখা দেয়। এ ধরনের ভাবাবেগের বেলায় একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব জগতে বিচরণ করে, নিজের সমস্যাবলীর মাঝে নিজেকে নিমগ্ন রাখে ; চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর প্রতি তার কোন উৎসাহ থাকে না, আর তাই কোন ব্যবস্থা গ্রহণে সে অক্ষম হয়। যেহেতু, কোরআনে যেরূপ চারিত্রিক শক্তির প্রশংসা করা হয়েছে সে ধরনের শক্তিশালী চরিত্র তার মাঝে থাকে না, ফলে বাহ্যিক জগতের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে কাজ করার সামর্থ্যও তার থাকে না। নিজেকে দুর্বল, অসহায় আর অপদার্থ ভেবে সে যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয় তা সমাধানের কোন চেষ্টা সে করে না। কেননা সে নিজেকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেনি, আর আল্লাহর অব্যর্থ সাহায্যের উপর সে ভরসা করে না, সেজন্য নিজেকে ভাবে একা আর অবলম্বনহীন। এরই ফলে সে নিজের ভিতরে যে স্বপ্নের জগৎ নির্মাণ করেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে ভয় পায়।

> যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে। আর যারা কুফুরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
>
> [কোরআন : ২ ঃ ২৫৭]

ভাবাবেগের ফলে উদ্ভূত এ হতাশাবোধ এ ধরনের লোকদের বিষণ্নতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আবেগপ্রবণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যে বিশেষ বিশেষ সমস্যায় ভোগে সেগুলো হল : একাকীত্ব, মানসিক

চাপ, বিষণ্নতা আর স্নায়ুদৌর্বল্য। তারা তাদের দুঃখ, বিষণ্নতা, শোকাতুরতা আর আত্ম-হননের জন্য কোন না কোন কারণ সর্বদাই তারা খুঁজে পায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি মেয়েকে তার বন্ধুরা হয়ত কেবল ঠাট্টা করেই কিছু বলেছে, কিন্তু এজন্য মেয়েটি সারারাত কান্না করা আর সে কথাটি বলার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিজের মনকে আচ্ছন্ন রাখাকেই স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারে। অন্য এক ঘটনায়, চুল পেকে যাওয়া কিংবা অন্য কোন শারীরিক খুঁতই তার বিষণ্নতার কারণ হিসেবে যথেষ্ট হয়ে দেখা দিতে পারে। "কেন আমার চোখের রং একটু ভিন্ন হল না ?" "কেন আমি আরেকটু লম্বা হলাম না ?" এ ধরনের ডজন ডজন, শত শত প্রশ্ন এমন লোকের মন ঘিরে রাখে যেগুলোই কিনা তাদের বিষণ্নতার যথার্থ কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

আবেগপ্রবণ লোক ; তাদের অন্তর্মুখিতা, নিঃসঙ্গতা, হতাশা – এসব ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আল্লাহ মানুষকে তাঁর উপর ভরসা করে মনে শান্তি পাওয়ার কথা বলেন

এ ধরনের লোক অন্ধকারে বসে কিছু একটা ভাবছে বলেই মনে হয়। নৈরাশ্যের কবিতা লিখছে, দিবাস্বপ্ন দেখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে, বৃষ্টিতে হাঁটছে, গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ছে, গোপনে কাঁদছে,

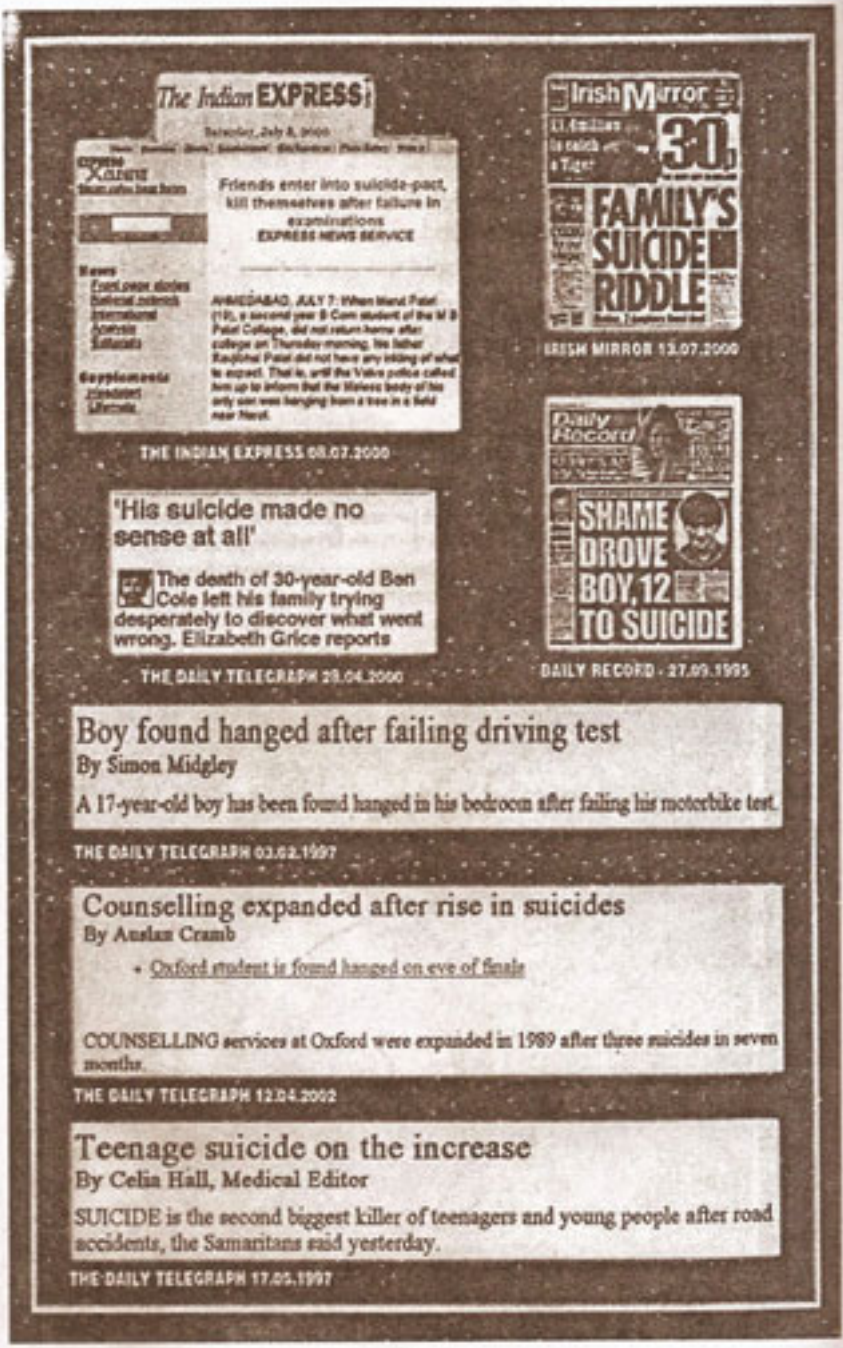
The Indian EXPRESS
Friends enter into suicide-pact, kill themselves after failure in examinations
EXPRESS NEWS SERVICE
THE INDIAN EXPRESS 08.07.2000
Irish Mirror
30,
FAMILY'S SUICIDE RIDDLE
IRISH MIRROR 13.07.2000
'His suicide made no sense at all'
The death of 30-year-old Ben Cole left his family trying desperately to discover what went wrong. Elizabeth Grice reports
THE DAILY TELEGRAPH 28.04.2000
Daily Record
SHAME DROVE BOY, 12 TO SUICIDE
DAILY RECORD - 27.09.1995
Boy found hanged after failing driving test
By Simon Midgley
A 17-year-old boy has been found hanged in his bedroom after failing his motorbike test.
THE DAILY TELEGRAPH 03.02.1997
Counselling expanded after rise in suicides
By Auslan Cramb
Oxford student is found hanged on eve of finals
COUNSELLING services at Oxford were expanded in 1989 after three suicides in seven months.
THE DAILY TELEGRAPH 12.04.2002
Teenage suicide on the increase
By Celia Hall, Medical Editor
SUICIDE is the second biggest killer of teenagers and young people after road accidents, the Samaritans said yesterday.
THE DAILY TELEGRAPH 17.05.1997

অশ্রুভেজা চোখে তার কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বলছে এমনি সব অবস্থায় প্রায়ই আপনি তাদের খুঁজে পাবেন। এদের মাঝে কেউ কেউ তাদের দুঃখ-বেদনা ঝেড়ে ফেলার একটি প্রয়াস হিসেবে অতিরিক্ত ধূমপান কিংবা মদ্যপান করে। এ লোকগুলো বিষণ্ণতা আর বেদনাময় এক অন্ধকার কাল্পনিক জগতে বাস করে, কোন কারণ ছাড়াই আত্মিক ও শারীরিক বেদনায় পরিপূর্ণ এক

তারা তাদের প্রিয় রক তারকার গান শুনে ভক্তিতে এতই আকুল হয় যে কখনো কখনো তারা ঐ গায়ক ব্যক্তির জন্য মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে। এটা ভাবাবেগ প্রবণতার একটি ধরণ। টেলিভিশন কিংবা পত্র-পত্রিকায় কখনো কখনো দেখা যায় যে, এ ধরনের ভাবাবেগ প্রবণতা অতিমাত্রার এত বেশি ভাবের উদ্ভব ঘটায় যে কনসার্টের মাঝেই তরুণ ভক্তরা মূর্ছা যায় এবং তাদের হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়

জীবনযাপন করে। যাই হোক না কেন, আল্লাহ যে ধরনের নীতি ও আচরণের অনুমতি দেননি – সেগুলোই এ মানুষগুলো অবলম্বন করে পড়ে থাকে।

এ ধরনের মানুষগুলো নিশ্চয়ই সারাটা জীবন একটা বন্ধ ঘরের ভেতরে অন্ধকারে বসে কাটিয়ে দিতে পারবে না। তাদের একটি সামাজিক জীবন থাকলেও তারা তাদের এ ভুলে ভরা আবেগময় অবস্থার বহিঃপ্রকাশ সর্বসমক্ষে করেই ফেলে। সাধারণতঃ তাদের মানসিকতা হয় ভঙ্গুর এবং নিজেকে এরা খুব সহজেই অপমানিত ভেবে থাকে। প্রতিটি শব্দ যে উদ্দেশ্যে বলা হয়নি তারা সে অর্থই বোঝে নেয়। সে অর্থটি থেকে আবার তারা এটাও বুঝে নেয় যে এটা তাদের বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে। সহজেই তারা খেকোদ্যম হয়ে মনোকষ্টে ভুগে। প্রায় বিনা উসকানিতেই তাদের চোখ জলে ছল ছল করে উঠে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে তারা কাঁদে।

আবেগপ্রবণতা, পুরুষের মাঝে সময়ের সাথে আরো অধিক পরিমাণে নৈতিক বিচ্যুতিতে পৌছতে পারে ; এ থেকে জন্ম নিতে পারে কোন গুরুতর মানসিক সমস্যা, মেয়েলী স্বভাব, অসঙ্গত যৌন আচরণ এমনকি সমকামী প্রবণতাও। একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি তার মাঝে বিদ্যমান বিকৃত আচরণকে লুকিয়ে রাখতে পারে আবার নির্লজ্জের মত সবার সামনে তা প্রচার করে বেড়াতেও পারে – এটা নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে। যেকোন মুহূর্তে সে তার চেপে রাখা প্রবৃত্তিকে আকস্মিকভাবে প্রকাশ করতে পারে ; এভাবেই সে তার গোপন প্রবৃত্তি, সংযম আর নৈতিকতার অভাবকে প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান সময়ের কিছু আবেগপ্রবণ, হতাশ আর অন্তর্মুখী লোকদের প্রকাশ্যে সমকামী আচরণ, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক-আশাক পরিধান করতে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। জনসমক্ষে তাদের এই আগ্রাসী আচরণে আমরা এখন অভ্যস্ত। আল-কোরআনে আল্লাহ যৌনবিকৃতির নির্লজ্জতার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেখানে হযরত লূত (আঃ) তার সম্প্রদায়ের লোকদের ডেকে বলেছিলেন ঃ

> আর আমি লূতকে প্রেরণ করেছিলাম। যখন সে তার কওমকে বলল ঃ "তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি ?
>
> তোমরা তো তোমাদের পুরুষদের কাছে গমন কর কামতৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে। বরং তোমরা হলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।"
>
> [কোরআন : ৭ ঃ ৮০-৮১]

মানুষ আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে সরে গেছে, তারা তাদের আবেগ ও কামনার দাস হয়ে আছে, অনুসরণ করছে শয়তানের পথ এগুলোই সকল কলঙ্কময় আচরণের নিশ্চিত কারণ।

কখনও আবেগের বশে ভীরু, মুখচোরা ও বিষণ্ন লোকগুলো সমস্ত নৈতিকতাবোধ বিসর্জন দিয়ে দেয় আর প্রবল উৎসাহে বিকৃত জীবন বেছে নেয় – যা শালীনতার সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। পাশের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে সমকামীরা মিছিল করছে – যা এ ধরনের নীতি ভ্রষ্টতার এক জ্বাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে মানব জাতির উদ্দেশ্যে এ হুঁশিয়ারিই উচ্চারণ করেছেন ঃ

> **"..... আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদের নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং সে আল্লাহ সম্বন্ধে তোমাদের এমন সব বিষয়ও বলতে বলে যা তোমরা জান না।"** [কোরআন : ২ ঃ ১৬৮-১৬৯]

যারা তাদের বিচারবুদ্ধি এবং প্রজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়েছে তারা তাদের আবেগ দ্বারা পীড়িত হয় এবং জীবনের বিকৃত পথে যেতে প্রলুব্ধ হয়

আবেগপ্রবণ যেসব নমুনা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত তুলে ধরেছি তা কম বা বেশি যেকোন পরিমাণে সে লোকদের মধ্যে বিদ্যমান যারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েছে আবেগের দাসত্ব করতে। কিন্তু এটা নির্ভর করে এতে জড়িয়ে পড়া মানুষগুলোর এবং তাদের পারিপার্শ্বিকতার উপর। উদাহরণস্বরূপ একজন রাগী খিটখিটে,

ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যতই কঠিন ও বদমেজাজী হোক না কেন, তারপরও সে তার গোপন স্বভাবের ছদ্মবেশে আবেগপ্রবণতা ও দুর্বলতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। এমন লোকগুলো হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিতভাবে কেঁদে উঠে বা বিলাপের আহাজারি করে নিজেকে লজ্জা ও অপমানের মাঝে ফেলে দেয়। সংক্ষেপে, যার ঈমান বা বিশ্বাস নেই বা বিশ্বাসীদের যে বিচক্ষণতা থাকা দরকার তা তাদের থাকে না, তারা মানসিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার অধিকারী হয়ে থাকে যা ভাবাবেগেরই পরিণাম। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ঘটনার প্রবাহমানতার উপর নির্ভর করে এ ভাবাবেগ প্রবণতা ভারসাম্যহীন নানা রূপে প্রকাশ পায়।

আল্লাহর প্রতি ভয় ও বিশ্বাস রয়েছে এমন বিশ্বাসী ঈমানদারদের মধ্যে আবেগপ্রবণতা নামক ব্যাধিটি দেখা যায় না। যেহেতু একজন ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীর উপর শয়তানের কোন প্রভাবই চলে না, তাই শয়তান তার আবেগপ্রবণতার অস্ত্রটিও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে না। আল-কোরআনের পনেরতম সূরার ৪২ আয়াতে আল্লাহ আদেশ করেন : "আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতাই নেই, তবে বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের ছাড়া।" এ কারণেই বিশ্বাসিগণ ঈমান, প্রজ্ঞা আর কোরআনের প্রতি তাদের গৃহীত দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে

> আর যখন সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না। শুধু এটুকু যে, আমি তোমাদের ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার উপর দোষ চাপিও না, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। এখন তোমাদের উদ্ধারে না আমি সাহায্যকারী হতে পারি, আর না আমার উদ্ধারে তোমরা সাহায্যকারী হতে পার। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি।
>
> [কোরআন : ১৪ : ২২]

গঠিত এক শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী হন, আর তারা হয়ে থাকেন দৃঢ়, সুস্থ, ভারসাম্যপূর্ণ আর উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন।

আজকের সমাজে আবেগপ্রবণতার সবচেয়ে সাধারণ একটি রূপ হল "রোমান্টিক প্রেম" (Romantic Love) ভালবাসার এ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে অর্জন করে আর তা দেখা যায় পারিবারিক বন্ধনসমূহে, বন্ধুত্বের মাঝে, সহকর্মীদের প্রতি সৌহার্দ্য হিসেবেও। এ ভালবাসার সম্পর্কটি সবচেয়ে বেশি দৃষ্ট হয় একজন নারী ও একজন পুরুষের মাঝে।

কারণ রোমান্টিক ভালবাসার এ ধারণাটি হয়ত সবচেয়ে সুদূর প্রসারিত এক ধরনের বিকৃত বা ভ্রান্ত আবেগপ্রবণতা। এ নিয়ে আমরা আরেকটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

আবেগপূর্ণ ভালবাসার ধারণা

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসতে হয় সেরূপ তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর জালিমরা যেমন বুঝবে এখন যদি তারা তেমন বুঝত! নিশ্চয়ই সব শক্তি শুধু আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।"

[কোরআন : ২ ঃ ১৬৫]

ভালবাসার রোমান্টিক ধারণা নিয়ে কথা বলার আগে ভালবাসা সম্পর্কে ঈমানদারগণের প্রকৃত ধারণাটি কি তা জেনে নেয়া প্রয়োজন। বিবেকবান ও ঈমানদার একজন ব্যক্তি জানেন যে আল্লাহই একমাত্র সত্ত্বা যাঁকে তার বিশ্বাস করতে হবে এবং হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পৌছতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন শূন্য থেকে (অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে), তাকে দান করেছেন তার দেহ, তার অন্তর, তার চেতনা, তার বিশ্বাস - যা কিছু তার রয়েছে সবই আল্লাহর দান। তার প্রতিটি প্রয়োজন আল্লাহ মিটিয়েছেন আর তা তিনি মিটিয়ে যেতেই থাকবেন। এ পৃথিবীর প্রতিটি অনুগ্রহের দান তিনি তার জন্যই তৈরি করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল ঈমানদার ব্যক্তিটি যখন আল্লাহর প্রতি নত হয়ে আত্মসমর্পণ করে তখন আল্লাহ তাকে তাঁর প্রতিশ্রুত চিরশান্তি ও ভালবাসার অনন্ত করুণায় সুখী করে তোলেন। এসব কিছুই আসে তাঁর অনন্ত দয়া ও মমতার মুক্ত ধারা থেকে। আর তাই ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা সবকিছুর উর্ধ্বে শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই। আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে সতর্ক করে বলেছেন, **"মনোনিবেশ কর তোমার স্বীয় রবের প্রতি!"** [কোরআন : ৯৪ ঃ ৮]

মানুষ একে অন্যের প্রতি যে মমতা অনুভব করে তার উৎস একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসেন, তিনি তাদের প্রতিও মমতা অনুভব করেন – যারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য মেনে নিয়েছেন। তাদের মাঝে আল্লাহর গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর এদের প্রতি অনুভূত ভালবাসাই হল খাঁটি ভালবাসা।

আকর্ষণ ও ভালবাসা অনুভব করার আরেকটি যথার্থ কারণ হল ভালবাসার পাত্রটির মাঝে উন্নত গুণাবলীর সমাবেশ থাকা। এ একান্ত আগ্রহ ও আকর্ষণের প্রতিউত্তরে যখন একইভাবে আরেকটি মানুষ সাড়া দেয় তখন তাদের সম্পর্ক মোড় নেয় ভালবাসার বন্ধনে। যাহোক এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, এ মহান গুণগুলোর মূল উৎসটি কোথায় তা সন্ধান করা এবং সমস্ত আগ্রহ, আকর্ষণ ও প্রেম সেদিকেই নিবিষ্ট করা। আর সে সত্ত্বাই হলেন আল্লাহ – যিনি সকল সৌন্দর্য ও প্রতিটি অসাধারণ গুণের উৎস এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে যেসব গুণাগুণ পাওয়া যায় তা তাঁর অনন্ত গুণাবলীর এক অতি ক্ষুদ্র প্রতিফলন মাত্র। আল্লাহর বান্দাগণ অল্প কিছু দিনের জন্য এ গুণাবলীগুলো প্রদর্শন করেন কিংবা তাদের মাঝে এগুলোর প্রতিফলন প্রদর্শিত হয়।

সুতরাং এটা বলা যায় যে, ভালবাসা কেবল আল্লাহর জন্যই অনুভূত হওয়া উচিত। যে জিনিসগুলোর মাঝে আল্লাহ পাকের গুণাবলী প্রতিফলিত হয় সেগুলোর প্রতি মমতা কেবল আল্লাহর নামে ও আল্লাহকে সহ কারো অন্তরে ও মনে লালন করা উচিত। কেউ যখন বিবেচনা করে যে আল্লাহ ব্যতিরেকেই তাঁর সৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব কিংবা ক্ষমতা রয়েছে আর সে ব্যক্তি বা বস্তুকে সেরূপে ভালবাসে, যেরূপ ভালবাসা শুধু আল্লাহ পাকের প্রতিই প্রদর্শন করা উচিত; তখন এ থেকেই নিশ্চিত প্রমাণ মেলে যে, সে ব্যক্তিটি আল্লাহরই সৃষ্ট জীবকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করছে।

সমাজে এমন বহু ধরনের শিরক সংঘটিত হয় যেগুলোর জন্ম হয় মিথ্যা আর অবৈধ ভালবাসা থেকে। আল্লাহকে ছেড়ে নিজের বাবা, পুত্র, স্ত্রী, পরিবার কিংবা পূর্বসুরীদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করাই ভ্রান্ত ও অবৈধ রূপের ভালবাসার একটি উদাহরণ।

পরবর্তী আয়াতে ইবরাহীম (আঃ) ব্যাখ্যা করেছেন যে, কিভাবে পৌত্তলিকগণ একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আর মূর্তিগুলোকে আরাধনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে ঃ

> **আর ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ "পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত দিবে। আর তোমাদের বাসস্থান হবে দোযখ এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"** [কোরআন : ২৯ : ২৫]

পবিত্র কোরআন আমাদের এভাবেই জানিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে ভালবাসার এ বন্ধনগুলো অবশেষে শেষবিচারের দিন ঘৃণা ও বিশ্বাসঘাতকতার রূপ নিবে। কারণ, মানুষ যখন তাদের মাঝে অসংযত ভালবাসা কিংবা প্রেমে বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে তখন তারা একে অপরকে অতি প্রণয়ভাজন উপাস্যের পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যা কেবল নিদারুণ যন্ত্রণার দিকেই নিয়ে যায়। যারা আল্লাহকেই একমাত্র প্রভু বলে মেনে নিয়েছে তারা কখনই অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর সমপর্যায়ে উপনীত করবে – এমনতর সম্ভাবনা থাকে না কিংবা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালবাসার সম্ভাবনা থাকে না। মূর্তি উপাসকরা ঠিক এর বিপরীত কাজটিই করে থাকে - যারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে ঃ

মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে যেরূপ ভালবাসতে হয় সেরূপ তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা প্রকৃত ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম। শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর জালিমরা বুঝবে এখন যদি তারা তেমন বুঝত। নিশ্চয়ই সব শক্তি শুধু আল্লাহরই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। [কোরআন : ২ : ১৬৫]

উপরের আয়াতটি, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসিগণের কি পরিমাণ ভালবাসা থাকে, তা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করছে। যদি কারো ভালবাসা আল্লাহপাকের চেয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি বেশি থাকে তখন আল্লাহর প্রতি তার ঈমান আছে কি-না তা বলা কঠিন। যদি কেউ উপরোক্ত কথার বিপরীতটি দাবি করে তখন বুঝতে হবে যে, হয় সে আন্তরিক নয়, অথবা সে আল্লাহপাক ও তাঁর দেয়া ধর্মকে যেভাবে বুঝা দরকার সেভাবে বুঝতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে, উপরের আয়াতগুলোর শেষাংশ থেকে জানা যায় যে, যাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে ভুল ও অসম্পূর্ণ ধারণা রয়েছে তারাই আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের আরাধনা করে। কারণ, আল্লাহকে যেভাবে মূল্যায়ন করা বা গুরুত্ব দেয়া উচিত - এ সকল লোক সেভাবে তাঁকে গুরুত্ব দেয় না।

[কোরআন : ৩৯ : ৬৪-৬৫]

তাই তারা ভালবাসে নিজেকে, আমরা যারা তাদের প্রিয়জন। যেমন, বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, মেয়ে বা ছেলে বন্ধুকে অথবা যে সকল মানুষকে তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে থাকে বা যাদের দেখে তারা মুগ্ধ হয় তাদেরকে। এ তালিকা অনেক দীর্ঘ থেকে পারে। কিছু মানুষ এমনকি প্রাণহীন জড়বস্তু কিংবা বিমূর্ত কোন ধারণার প্রতিও মমতা অনুভব করে। অর্থ, সম্পত্তি, বাড়ি, গাড়ি কিংবা সামাজিক অবস্থান, পদবী ও ক্ষমতা ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণাকেও তাদের আরাধনার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভক্তি বা প্রেম ঈমানের হাত ধরে চলে না, তাই কাউকে আল্লাহর অংশীদার জ্ঞাপন কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান মনে করা – এসব কিছু পাপেরই অংশ। কারণ এ প্রেম তো মানুষকে বিচক্ষণতার সাথে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় না, এ প্রেম হল আবেগে পরিপূর্ণ অলীক বা রোমন্টিক প্রেম। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন : এ ভালবাসা মানুষের কোন উপকারেই আসবে না এবং তাঁর দৃষ্টিতে যে প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে তাও তিনি বলেছেন ঃ

মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের মহব্বত – যেমন, নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি-পশুরাজির এবং ক্ষেত-খামারের। এসবই হল, পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

[সূরা : আলে-ইমরান : ১৪]

এসব জিনিসকে আমাদের ভালবাসতে হবে আল্লাহ পাকের সৃষ্ট বস্তু হিসেবে আর উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রতিটি জিনিসই আমাদের উপর আশীর্বাদ হিসেবে দান করেছেন। মানুষের ভালবাসা নিঃসন্দেহে এক অপূর্ব বিস্ময়কর অনুভূতি, যে অনুভূতির স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাই। কোরআনে বলা হয়েছে যে, **"মানুষকে আল্লাহ "সর্বোৎকৃষ্ট গঠনে" সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈমানদারগণের উচিত - তাদের জন্য আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করা যারা আসলেই তা পাওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহপাকের অনুগত এবং যারা সৎ চরিত্রের অধিকারী। যে অকৃত্রিম ভালবাসা একজন বিশ্বাসী অনুভব করে তা সমাজের প্রচলিত ধর্মবিহীন ভালবাসার সাথে কখনই তুলনীয় নয় ; এ এক গভীর মহিমাময়, সুন্দর, আন্তরিক অনুভূতি।**

পরের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সে সকল মানুষের প্রতি দৃষ্টি দেব যারা এ মহীয়ান সুন্দর অনুভূতিটির কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি - যা আল্লাহপাকের দেয়া এক আশীর্বাদ ; আর সাথে সাথে আমরা নারী ও পুরুষের সেই প্রেমের প্রতিও দৃষ্টি দেব যে প্রেম প্রায়ই এক ধরনের পৌত্তলিকতার জন্ম দিয়ে থাকে।

নারী ও পুরুষের পৌত্তলিকতাপূর্ণ ভালবাসা

সবচেয়ে সংকটপূর্ণ যে উপাদানগুলো মানুষকে "পৌত্তলিকতার" দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেগুলোর মাঝে অন্যতমটি হল নারী ও পুরুষের মাঝে আল্লাহপাকের অনুমোদন ছাড়া গড়ে উঠা প্রেমের সম্পর্ক। যা কিনা বিয়ে কিংবা বিয়ে ছাড়াই নারী-পুরুষের একত্রে বাস করার (Living together) রূপ নিতে পারে - আজকাল যা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

ভালবাসার এ আবেগময় উপলব্ধিতে প্রেমিক-প্রেমিকারা সেই পরস্পরের প্রতি সব দায়িত্ববোধ প্রদর্শন করে থাকে যা কেবল আল্লাহর জন্য করা উচিত এবং তারা একে অন্যের প্রতি যে সকল অনুভূতির প্রকাশ ঘটায় যা কেবল আল্লাহর-

জন্যই সংরক্ষণ করা উচিত, তাদের দেখে যেন মনে হয় তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ছাড়াই স্বতন্ত্র এক সত্ত্বা। মনের মাঝে আল্লাহকে ধারণ করার পরিবর্তে তারা কেবল একে অন্যের কথাই ভাবে। ভোরের আলোয় প্রথম চোখ মেলে নতুন এ দিনের জন্য তারা স্রষ্টাকে ধন্যবাদ দেয় না, এর পরিবর্তে স্মরণ করে তার প্রেমিক বা প্রেমিকাটিকে ; আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কথা তারা ভাবে না। বরং কি করে একে অন্যকে খুশী করা যায় সে উপায়ই খুঁজে তারা। তারা একে অন্যের জন্য নিজের জীবনও বিলিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাঁর জন্য নয় যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা একে অন্যকে দেবতায় পরিণত করে। এভাবে, আমরা যখন পৃথিবীময় এত বিস্তৃত প্রেমের এ বিকৃত উপলব্ধিটির নানা দৃষ্টান্ত আলোচনা করি, তখন দেখি কল্পনা বিলাসী আবেগপ্রবণ নর ও নারী নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে একে অন্যের প্রতি ঘোষণা করছে – 'দেবতার মত আমি তোমার স্তবগান করি, 'যেখানেই যাই না কেন আমি ভাবি শুধু তোমাকেই' এমন কতই না অভিব্যক্তি। যাই হোক, যেদিকেই একজন দৃষ্টি দিক বা যেখানেই সে যাক না কেন গভীর ভালবাসা ও ভক্তি পাওয়ার যোগ্যতা যিনি রাখেন তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন – এ বিশ্ব চরাচরের একমাত্র প্রতিপালক।

আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, ভাবাবেগময় ভালবাসাকে নির্মল প্রেম হিসেবে ধরে নেয়া হয় যদিও তা আল্লাহপাকের দৃষ্টিতে এক ধরণের তিরস্কারযোগ্য শিরক। অবশ্য শয়তান মানুষকে সত্যের প্রতি অন্ধ বানিয়ে রাখে, আর তাই এক্ষেত্রে, সে আবারো প্রেমকে মনোরম প্রীতিকর করে তোলে তাই মানুষ সত্যকে বিকৃতরূপে দেখতে পায় এবং শয়তান মানুষকে তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়ে নিয়ে যায় ঃ

> আল্লাহর কসম ! আমি আপনার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভিত করে দেখিয়েছে। সুতরাং সে আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [কোরআন : ১৬ : ৬৩]
>
> .....শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল জ্ঞানবান-বিচক্ষণ লোক। [কোরআন : ২৯ : ৩৮]

এ ধরনের রোমান্টিক ভালবাসায় একজন নারীর প্রতি যে ধরনের ভ্রান্ত তীব্র

অনুরাগ অনুভূত হয় পবিত্র কোরআনে বিশেষভাবে তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এমন ভালবাসার পাত্র থেকে পারে যে কোন নারী : থেকে পারে নিজের স্ত্রী, বান্ধবী, দূরের কামনাবাসনার ঊর্ধ্বে কারো প্রতি প্লেটোনিক ভালবাসা। এ ধরনের প্রেম যদি আল্লাহপাকের যথার্থ স্মরণ থেকে মানুষকে বিরত রাখে কিংবা মানুষের অন্তরে প্রিয়তমাটিই যদি আল্লাহর চেয়ে অধিক বরণীয় হয়ে উঠে তবে সেই প্রেম তাকে ঠেলে দেয় শিরক নামক পাপের দিকে। অবশ্যই এ আশংকাটি কেবল পুরুষই নয়, নারীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

নর-নারীর এ আবেগঘন সম্পর্কের মাঝে যারা নিমগ্ন হয়ে রয়েছে তারা নিজেদেরকে যে বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা সম্পর্কে প্রায়ই অবহিত থাকে। কেননা তারা শৈশব থেকেই এক পথভ্রষ্ট সমাজ থেকে পাওয়া পথ নির্দেশ অনুসরণ করে আসায় তারা জানতে পারে না যে তাদের সঠিক পথে চলার একমাত্র পথপ্রদর্শক হল আল-কোরআন ; আর তাই তারা যে ধরনের জীবন-যাপন করছে তা যে আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি ভুল পথ সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বে-খবরই রয়ে যায়। কেননা আল্লাহর সম্পর্কে না জেনে তারা জীবন-যাপন করে আর তাই অজ্ঞতার পঙ্কিলতার মাঝে তারা বন্দী হয়ে থাকে, যদিও আমরা আগেই বলেছি যে, তারা

রোমান্টিক ভালবাসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিষাদ, বিমর্ষতা আর দু:খবাদ হল সহজাত বিষয়। এ ধরনের সম্পর্কে জড়ানো ব্যক্তিদ্বয়ের একজনের কাছে আরেকজনই যেন সারা পৃথিবী সম। অপরজন কি কথা বলল তা ভেবে ভেবে, কিংবা তার মুখের অভিব্যক্তির অর্থ বের করতে করতেই তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে। ফলে এটা মনের মাঝে অযৌক্তিকভাবে বিষাদময় অবস্থার উদ্রেক ঘটায়

নিজেদেরকে সঠিক পথেই রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। যাই হোক, আল্লাহর উপর তাদের কোন বিশ্বাস থাকে না বলেই তাদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অন্ধ, দৃষ্টিহীন হয়েই থাকে।

এ চেতনাহীন প্রেমে বাধা পড়ে যেসব নর-নারী একে অন্যকে দেবাসনে বসিয়েছে কখনও কখনও তাদের আত্মধ্বংসী কার্যকলাপের দিকে ধাবিত থেকে দেখা যায়। যেমন, প্রণয়ের জালে বন্দী দু'জন তরুণ-তরুণী কখনও স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া মৃত্যুকে তাদের যুগল প্রাণের পরিতুষ্টি লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

তরুণ ছেলে-মেয়েরা যখন দেখতে পায় যে তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার মানুষটির আর আগ্রহ নেই তখনই তাদের মাঝে বিষণ্ণতার উদ্ভব ঘটে

বাস্তব পরিস্থিতি যখন দু'জনের মিলনকে অনুমোদন করে না তখন তারা তাদের ভালবাসাকে "অমর" করে রাখার জন্য দু'জনে হাতে হাত রেখে কোন ব্রীজ বা সেতু থেকে নিচে লাফিয়ে পড়তে পারে কিংবা তাদের "আত্মা যেন অনন্তকাল এক সাথে থাকে" এমন সব অযৌক্তিক ধারণায় এ ধরনের কাজ করতে পারে। অবশ্য এমন ধারার কাজ করতে গিয়ে তাদের খেয়ালই থাকে না যে, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের দোযখের থাবায় ছুঁড়ে মারছে। এমন একটি হারাম কাজ করার সময় তারা তো এর মাঝে কোন ভ্রান্তি দেখতেই পায় না বরং আরো বিশ্বাস করে যে, তাদের মৃত্যুর পর তারা, আল্লাহর সঙ্গে নয়, বরং একে অন্যের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা মৃত্যুর ফেরেশতাকে যখন দেখতে পাবে তখনই তারা তা বুঝতে পারবে, কিন্তু

তখন যে বহু দেরি হয়ে যাবে। প্রেমের প্রতিদান না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন লোকের গভীর ব্যথা ভরা চিঠি আমরা তো প্রায়ই খবরের কাগজে পড়ে থাকি। রোমান্টিকতা যে কিভাবে একজন মানুষের মন ও বিবেককে অন্ধ করে রাখে এগুলো হল তারই পরিষ্কার উদাহরণ।

কিন্তু যখন চোখের সামনে থেকে এ আবরণ সরিয়ে নেয়া হবে আর মানুষ দেখবে অনন্তকালের শাস্তির প্রতিশ্রুতিই সত্য তখন সে নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে তার সেই সাথীকে মৃত্যুপণ হিসেবে পর্যন্ত দিতে চাইবে, বেঁচে থাকার সময় যার প্রতি তার ছিল গভীর অন্ধ অনুরাগ এবং রোমান্টিকতার মোহময় আবেশে যাকে সে প্রায় আরাধনার আসনে বসিয়ে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত এ মানুষগুলো কি করবে তা আল্লাহ তায়ালা কোরআনের আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপে :

> **যদিও তাদের একজনকে অপরজনের সাথে মোলাকাত করানো হয়। সেদিন গুনাহগার লোকেরা আযাব থেকে অব্যাহতির জন্য স্বীয় সন্তানদেরকে দিতে চাইবে, স্বীয় স্ত্রী ও ভাইকেও, আর তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকেও, যারা তাকে আশ্রয় দিত, এবং পৃথিবীর সবাইকে; অতঃপর যাতে এসব তাকে রক্ষা করে।** [কোরআন : ৭০ : ১১-১৪]

সেই একই পরিস্থিতি অন্য একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

> **সেদিন মানুষ নিজের ভাই থেকে পলায়ন করবে, এবং নিজের মাতা ও নিজের পিতা থেকে, আর নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান-সন্ততি থেকেও। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন ব্যস্ততা থাকবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী থাকতে দিবে না।** [কোরআন : ৮০ : ৩৪-৩৭]

রোমান্টিক প্রেমের যে ধারাটি পৌত্তলিকতার দিকে ঠেলে দেয়, সমাজ তাকে স্রেফ রোমান্স এবং 'অকৃত্রিম আবেগ' বলে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে, এমনকি সমাজে তা প্রশংসিত হয় এবং এ কাজে উৎসাহও দেয়া হয়। সচরাচর দেখা যায়, তরুণ বয়সটিতে রোমান্টিকতার আবেশে মানুষ আচ্ছন্ন থাকে যার ফলে তারা ধর্ম, বিশ্বাস বা ঈমান আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়, রোমান্টিকতা এভাবেই তাদের মন ও বিবেকের উন্নয়ন ঘটাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা আল্লাহকে ভুলে যায়, তাঁকে ভালবাসা

কিংবা ভয় পাওয়ার ব্যাপারটি তাদের কাছে অজানা থেকে যায়। পথহারা এ প্রজন্মের কাছে এ ধরনের পৌত্তলিকতাব চর্চা অতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

সিনেমা টেলিভিশন প্রায়ই দর্শকদের উপর রোমান্টিক আবেগময় বিষয়গুলো চাপিয়ে দেয়। ভাব প্রবণতাকে মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে তারা

মতামত জাহির করে। সাহিত্য, সংগীত ও কারো সবচেয়ে নিয়মিত বাজারজাত যোগ্য বস্তুটি হল রোমান্স।

> তাদের মুখমন্ডল যেন আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের আস্তরণ দিয়ে। এরা দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর যারা শিরক করত তাদের বলব; "তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে স্থির থাক।" অত:পর আমি তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।
>
> [কোরআন : ১০ : ২৭-২৮]

শয়তান খুব ভাল করেই জানে যে ভাববিলাসিতা (Sentimentality) হল একটি ব্যাধি যা মানুষকে সঠিকভাবে ভাবতে, বাস্তবতাকে চিনতে, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতে, পরকাল ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করতে দেয় না এবং মানুষকে ধর্মচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অবশেষে পৌত্তলিকতার দিকেই ঠেলে দেয়। তাই, শয়তান প্রতি পদক্ষেপে অনুভূতিশীল (Sentimental) ব্যাপারগুলোর তীব্র ও অবিরাম গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে সমাজকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবার পথ খুঁজে বেড়ায়।

ফলস্বরূপ, যারা মনে করছে যে পৌত্তলিকতা কেবলই মিথ্যা দেবতা বা কাঠ বা পাথরের তৈরি দেবমূর্তির উপাসনা তারা যেন এই ধরনেরও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত মনে না করে সাবধানে থাকেন এবং নিজেদের সেসব লোকের দলে না ভেবে মনোযোগী হন যারা শেষবিচারের দিন বলবে :

"আমাদের রব আল্লাহর কসম, আমরাতো মুশরিক্ ছিলাম না।"

[কোরআন : ৬:২৩]

একজন বিশ্বাসীর ভালবাসা
The Love of a Believer

সংক্ষেপে বললে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি কিংবা আল্লাহর কোন সৃষ্ট জীবের প্রতি কারো প্রেমের অনুভূতিকে পরিচালনা করাই হল, পৌত্তলিকতার পথে ধাবিত হওয়ার একটি বিপজ্জনক কারণ। বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আমরা

আগেই বলেছি যে তাঁরা কেবল আল্লাহকেই গভীরভাবে ভালবাসে, যদিও তাঁরা তাঁদের ঈমানদার সঙ্গীদের এবং আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের মাঝে আল্লাহ তায়ালার মহান গুণাবলীর প্রকাশ দেখলেই তা চিনে নিতে পারে। তারা কেবল আল্লাহর কারণেই ভালবাসে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা কাউকে ভালবাসে না। নবী মুহম্মদ (স.)–ও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, **"তোমাদের মাঝে যারা শুধু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করে মৃত্যুবরণ করবে তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে।"**[১৫] এটা কেবল ঈমানের প্রমাণই নয়, ঈমান বা বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় একটি শর্তও।

একজন বিশ্বাসীর ভালবাসা আলোর মতই স্বচ্ছ ও নির্মল এবং তা হৃদয়ের গভীরেও ছড়িয়ে দেয় এক জ্যোতির্ময় স্নিগ্ধতা, কেননা ভালবাসার প্রকৃত আধার হলেন একমাত্র আল্লাহ। এ কারণেই ভালবাসার মানুষটির মৃত্যুতে ঈমানদার ব্যক্তি কখনো গভীর দু:খে ভেঙ্গে পড়ে না, কেননা তার মাঝে বর্তমান গুণাবলীগুলো তো আল্লাহর গুণেরই প্রতিফলন ; প্রিয় কোন বস্তু হারিয়ে গেলেও সে হতাশ হয় না। তার ভালবাসার পাত্রটির মাঝে যে পার্থিব ও আত্মিক কল্যাণ রয়েছে এর মাঝে যত সৌন্দর্য রয়েছে তা শুধু আল্লাহরই ছায়া – তাঁরই গুণের প্রতিফলন এটা সে মুমিন ব্যক্তিটি জানেন। আল্লাহ অমর, তিনি অবিনশ্বর, কালাতীত, অনন্ত এক সত্তা ; আর সবচাইতে বড় কথা হল তিনি বিশ্বাসীদের ঘাড়ের শিরার চেয়েও অধিকতর কাছে অবস্থান করেন। সুতরাং, তাঁর উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই, কেননা আল্লাহ শুধু তাঁকে পরীক্ষা করতেই তাঁর সামনে থেকে সেই জিনিসটি সরিয়ে নিয়েছেন যে জিনিসে ছিল আল্লাহপাকেরই ছায়া। যদি সে তাঁর বিশ্বাস ও অটল ধারণায় অবিচল থাকে তবে এ দুনিয়া বা পরকালে যা সে কামনা করবে তাই আল্লাহ পাকের সুন্দর অভিব্যক্তিরূপে প্রচুর পরিমাণে তাঁকে দেয়া হবে।

তাই, এমন কোন পরিস্থিতি নেই যা তাঁকে বেদনা দিতে পারে, কেননা এ রহস্যটি সে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং অর্জন করেছে খাঁটি ঈমান। বিশ্বাসিগণের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থাটি আল্লাহ এ কথাগুলোয় ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

নিশ্চয়ই যারা বলে : "আমাদের রবতো আল্লাহ" এবং তাতে অটল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" [কোরআন : ৬ : ২৩]

শারীরিক অসুস্থতা কারণ : রোমান্টিকতা

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। [কোরআন : ১০ : ৪৪]

আত্মিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি রোমন্টিকতা দৈহিক অবস্থারও অবনতি ঘটায়। সবচাইতে বড় কথা হল, একারণে এরূপ স্পষ্ট কিছু শারীরিক পরিবর্তন ঘটে যায়, যা মানুষ চাইলেও লুকোতে পারে না। এটা স্বাভাবিক যে মানুষ যদি মনের কষ্টে ভোগে, দুর্ভাবনা ও দুঃখের মাঝে থাকে তবে তা অবশ্যই তার বাহ্যিক চেহারায় প্রতিফলিত হবে। একজন আবেগপ্রবণ মানুষের মৌখিক অভিব্যক্তিতে, হাত নাড়ানোতে, কণ্ঠস্বরে – সব কিছুতেই একটি সত্য প্রকাশিত হয়ে আসে যে এ মানুষটির (নারী কিংবা পুরুষ) ব্যক্তিত্বকে শাসন করছে তার আবেগময় অনুভূতিগুলো।

আবেগপ্রবণ মানুষের মাঝে "সাইকো সোমাটিক" (Psycho Somatic) বা "মানসিক চাপ" থেকে উদ্ভূত অসুস্থতার কারণে যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তার লক্ষণগুলো আমরা চিনে নিতে পারি। যখন তাদের শরীর আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না তখন তারা দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম ভেঙ্গে পড়ে আর তারা হয়ত এক রোগ থেকে অন্য আরেকটি রোগে ধরাশায়ী হয়, নয়ত দীর্ঘস্থায়ী কোন রোগ এসে তাদের দেহে বাসা বাঁধে, সুস্থ হওয়ার আর অবকাশ দেয় না।

এ ধরনের অসুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহে আরো নানাবিধ পরিবর্তন আসতে থাকে ; কারো মাথার চুল পড়ে যেতে থাকে, কিংবা অকালে পেকে সাদা ও নির্জীব হয়ে যায় ; ত্বক তার আর্দ্রতা ও স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে হয় শুষ্ক, পুরু, বলিরেখায় পূর্ণ আর ফেটে যেতে থাকে যার ফলে তা সহজেই সংক্রমণ প্রবণ হয়ে যায়। অধিকন্তু, কোষগুলোর পুনরুৎপাদন ক্ষমতা মন্থর হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের ত্বকে এক স্থায়ী পরিবর্তন আসে ; তাদের গাত্রবর্ণ হয়ে যায় ফ্যাকাসে, পাণ্ডুর ; চোখ হয় নিষ্প্রভ, দীপ্তিহীন। তাই এটা স্পষ্ট যে, রোমান্টিক বিষাদপ্রবণ লোকগুলো অবিরত নিয়ত নিজেদের জন্যই সমস্যা ডেকে নিয়ে আসে আর সময়ের আগেই বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়। বছরের পর বছর ধরে অবিশ্রান্ত দুর্ভাবনা আর মনের ভিতরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হতে হতে আর মানসিক অশান্তিতে ভুগতে ভুগতে তাদের দেহ নিজের ভার আর বইতে পারে না। ফলে এরা হয় অকালবৃদ্ধ, দৈহিক অবনতির নানা উপসর্গ এসে ভীড় করে তাদের শরীরে।

সেন্টিমেন্টালিটি বা আবেগ-প্রবণতার কারণে যে মানসিক সমস্যায় লোকেরা জর্জরিত হয় সেগুলো তাদের দৈহিক নানাবিধ পরিবর্তন ও রোগ-শোকের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়

আবেগপ্রবণতা মানুষের শরীরে যে ক্ষতিসাধন করে তার শেষ এখানেই নয়। তার ভেতরকার বিষাদের, সংযমের চাপা বেদনার ছাপ এসে লাগে তার চেহারায়, আর তার আচরণে ; গুরুতর ভাবে কমে যায় তার সকল গতিময়তা, চঞ্চলতা, উদ্যম, জীবনের সকল উচ্ছ্বাস, ভালবাসার আনন্দ একটু একটু করে ক্ষয়ে যায় ; সেই সঙ্গে তার দেহও ক্ষয় হতে তাকে। তার নিষ্প্রভ চোখের চাহনি, পাতলা ও নির্জীব চুলে, আর বেদনায় মুখের মাংসপেশীর টান টান ভাব – এসব নিয়ে তার অভিব্যক্তি হয় বিষাদময় কঠিন, ব্যথা ভরা, মলিন। যে ধরনের দৈহিক পরিবর্তন ঘটতে পারে তাদের মাঝে এগুলো সামান্য কতক উদাহরণ মাত্র। একইভাবে দেখা যায়, যারা উত্তেজনায় টান টান মানসিক চাপে ভুগে আর সহজেই যাদের চোখের পানি চলে আসে - তাদের তুলনায় সংযমী, শান্ত ও নির্মল আনন্দে জীবন কাটানো উৎফুল্ল লোকেরা দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয় এবং এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও আজ প্রমাণিত হয়েছে যে তারা অধিকতর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

অধিকন্তু, এধরনের নানাবিধ দৈহিক পরিবর্তনের শিকার হয়ে তারা তাদের দুঃস্বপ্নকে অধিকতর মন্দাবস্থার দিকে নিয়ে যায় ; এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়িত্ব, পৃথিবীর অভ্যন্তরে মানুষের অসহায়ত্ব আর আল্লাহর কাছে ঈমানের সঙ্গে নতিস্বীকার করার পরিবর্তে তারা তাদের কষ্টের কথাই ভাবে শুধু। কেননা পরিণত বয়স হতে ও যে কল্যাণ আসতে পারে আর সেই কল্যাণের সুন্দর প্রভাব রয়েছে – তারা তা ভেবে দেখে না। বরং তারা অবিরাম দুর্ভাবনায় পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে হতাশায় ভোগে।

দুর্ভাবনার এই অচ্ছেদ্য চক্রে আবদ্ধ হয়ে তারা এমন এক গুরুভারে নিশ্চল হয়ে থাকে যে সেটি তারা বাস্তবে নির্মূল করতে আর সক্ষম হয় না। প্রকৃতপক্ষে, চিকিৎসকগণ বলেন যে দুঃখ, দুর্ভাবনা আর চাপ থেকে অসংখ্য রোগের জন্ম হয়ে থাকে আর সেগুলো থেকে আরোগ্য লাভের একমাত্র উপায় জীবনের আনন্দকে খুঁজে নেয়া এবং আরো আশাবাদী হওয়া।

এটা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, নানাবিধ শারীরিক গোলযোগ; যেমন, ঘুম ও খাওয়ার গোলযোগ, উচ্চ কিংবা নিম্ন রক্তচাপ, পাকস্থলী, কিডনী আর হার্টের সমস্যা, এজমা, এলার্জি, একজিমা, সোরিয়াসিস, মাইগ্রেন, ক্যান্সার আরও নানাবিধ ব্যাধিগুলো চাপ (Stress) ও বিষণ্নতার সঙ্গে জড়িত মানসিক সমস্যাবলী হতে জন্ম নেয়।

শরীর যখন অশান্তি বা চাপের মুখোমুখি হয় তখন দেহে জৈব-রাসায়নিক এক পরিবর্তন ঘটে যারই ফলে শক্তির ব্যবহার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে ; আর তখনও যদি মানসিক চাপ অব্যাহত থাকে তখন শরীরবৃত্তী নানাবিধ কার্যাবলীতে বৈষম্য ঘটে।

মানসিক চাপ ও ব্যথার মাঝে যে একটি সম্পর্ক রয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলেন : মানসিক চাপ ও তার ফলে যে স্নায়ুবিক চাপ ও ব্যথার উদ্ভব ঘটে তাদের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। মানসিক চাপের ফলে যে স্নায়ুবিক চাপের জন্ম হয় তাতে শিরাগুলো সংকুচিত হয় এবং মস্তিষ্কের কোন কোন জায়গায় রক্ত প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের দেহের টিস্যুকে কিছু সময়ের জন্য রক্তশূন্য অবস্থায় রেখে দিলে সেখানে সরাসরি ব্যথার সৃষ্টি হয়। কেননা, সম্ভবত এ উত্তেজিত টিস্যুগুলোয় অধিকতর অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, আবার সেখানের টিস্যুগুলোতেই রক্তাভাব দেখা দেয়, তখন অধিকতর অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা ও রক্তস্বল্পতা - এ দুই মিলে কিছু কিছু ব্যথার গ্রাহক বা Receptor-গুলোকে উদ্দীপ্ত (Stimulate) করে। ইতিমধ্যে

উত্তেজনার সময় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কার্যকরী এড্রেনালিন আর নর-এড্রেনালিন নামক হরমোন বিমুক্ত বা নিঃসৃত হয়। এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্তেজিত মাংসপেশীর টান টান ভাব বৃদ্ধি করে। এভাবে, ব্যথার ফলে উত্তেজনা হয় যা আবার দুর্ভাবনার উদ্রেক ঘটায় – যারই ফলে আবারো ব্যথা আরো বেড়ে যায়।[১৬]

চাপ ও বিষণ্নতা সম্পর্কিত বিভিন্ন অবস্থা, যেমন- স্মৃতিশক্তি হারানো, মনোযোগ হ্রাস পাওয়া, সঠিক বিচার ও চিন্তা-ভাবনা করার অভাব, স্নায়ুবিক স্পন্দন বা টান এবং নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ – এগুলো অবিশ্বাসী, ঈমান বিহীন লোকদের মাঝে দেখা যায় ; যেখানে বিশ্বাসী ঈমানদারগণ আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে স্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ। এর কারণ হল – মনের প্রকৃত শান্তি আর স্থায়ী আনন্দ পাওয়া যায় একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য মেনে নিয়ে এবং নিজেকে তাঁরই হাতে সমর্পণ করার মাধ্যমে। ঈমানদারগণের মনের শান্তি ও সুখ কখনই তাদের ছেড়ে যায় না। কারণ সে নিজেকে সপে দিয়েছে আল্লাহর কাছে, সমর্পণ করেছে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তির কাছে আর তার জীবন কেটে যায় আল্লাহর উপর গভীর আস্থা নিয়ে। এ ধরনের শারীরিক অবনতির হাত থেকে সে মুক্ত থাকে আল্লাহ তায়ালারই অপার করুণায়।

রোমান্টিকতা যে বিষাদের অনুভূতি মানুষের মনে একটু একটু করে ঢুকাতে থাকে, তা একটি ভয়ংকর ব্যাধি যা শুধুমাত্র ঈমান বা বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও ঈমানেরই বয়ে নিয়ে আসা সুখ ও আনন্দের মাধ্যমে দূর করা যায়। বিশ্বাসিগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশের পথে এমনিভাবেই এই কথামালার মধ্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহিমা কীর্তন করবেন :

আর তারা বলবে : "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূরীভূত করলেন। নিশ্চয় আমাদের রব পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"

[কোরআন : ৩৫ : ৩৪]

উপসংহার

রোমান্টিকতার ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায়

আল্লাহ মোত্তাকীদের নাজাত দেবেন তাদের সাফল্যের সাথে, কোন প্রকার কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

[কোরআন : ৩৯ : ৬১]

সেন্টিমেন্টালিটি বা ভাবাবেগ প্রবণতা সেসব লোকের সবচেয়ে সাধারণ একটি চারিত্রিক দোষ যারা ধর্মের বিপরীতে একটি মূল্যবোধ ও জীবন ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে। অবশ্য, যেমন বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে ভাবা হয় যে এটা জন্মগতভাবে পাওয়া একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সেটি আর পরিবর্তন করা যাবে না – আসলে ব্যাপারটি তা নয়।

আত্মিক এ অবস্থাটি এমনি যা একজন ব্যক্তি সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। যারা দাবি করে যে অন্তর্মুখিতা, ক্রন্দনরোগ, বিষণ্নতা, ক্রুদ্ধ আচরণ – এ সবকিছু ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না তারা যদি একটুখানি আন্তরিকভাবে চিন্তা করে দেখেন তবে বুঝতে পারেন যে তাদের এই দাবিখানি সঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি একজন হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে খুব মোটা অংকের টাকা বা এমন মূল্যবান কিছু দেবার প্রস্তাব দেয়া হয় তবে সে সাথে সাথেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় – এ থেকে এ সত্যটুকু পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে যদি কেউ ইচ্ছে করে তবে সে সহজেই তার হতাশাগ্রস্ত মনোভাব দূর করতে পারে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, একজন মানুষ যে সেন্টিমেন্টাল কিংবা আবেগে ভরা মনোভাব গ্রহণ করে নিয়ে দিন কাটায় তা আসলে তারই চারপাশের মানুষের প্রতি তার মনোযোগ বা বিবেচনার অভাবেরই নিদর্শন এবং এটি সে ব্যক্তির নিজের প্রতি নিজের অবিচারেরই একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত, যেমন কোরআন বলে ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।" [কোরআন : ১০ : ৪৪]

অবশ্য আবেগ দিয়ে তাড়িত সেন্টিমেন্টাল লোকেরা কখনও এ সত্যখানি উপলব্ধি করতে পারে না। কেননা, তাদের মনের জগতটি অবিরত বিষাদে আচ্ছন্ন, হতাশায় অন্ধকার। আসলে যাই ঘটুক না কেন, তারা সবকিছুর মাঝেই সর্বদা খুঁজে পায় বেদনা ও দুর্ভাবনাকে। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অন্যায় করে। এ সত্যটি কোরআনে নিম্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা আনন্দিত হয় আর যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ আসে, তবে তারা তখনই নিরাশ হয়ে পড়ে।"

[আল-কোরআন : ৩০ : ৩৬]

অসুখী, অতিমাত্রার আবেগপ্রবণ আর হতাশ মানুষেরা এ নিখিল বিশ্বের অনাবিল সৌন্দর্য ও সৃষ্টিকর্তার করুণা ভরা দানগুলো দেখতে পায় না। সৌন্দর্য আর রূপলাবণ্যে ভরপুর অসংখ্য নমুনা হয়ত তাদেরই চারপাশে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তবু তারা কেবল জিনিসের নেতিবাচক দিকটি দেখতে পায় এবং তখন এমনকি আরো হতাশ হয়ে পড়ে। যাই হোক, মহান আল্লাহ তাঁর দয়া ও অপার করুণায় মানুষের নিমিত্ত আশীর্বাদ হিসেবে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। একজন ঈমানদারের মনের সম্মুখে এ ধারণাটি রয়ে যায় এবং তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর অসীম অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকেন

এ ধরনের লোকেরা যদি মনের এই রোমান্টিক বা আবেগপ্রবণ অবস্থা থেকে মুক্তি বা রেহাই পেতে আর এ ব্যাধিটি থেকে আরোগ্য লাভ করতে চায় তবে তাদের শয়তানের মিথ্যা ওয়াদা আর তার প্রতারণা থেকে পূর্ণ সচেতনতাসহ সদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। আর কেবল একজন মানুষের বিশ্বাস বা ঈমানই পারে সেটি সম্ভব করে তুলতে।

একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি রোমান্টিকতার দুর্বল দিকগুলো নিজের জন্য অশোভন দেখতে পাবেন। তার আচরণ হবে যুক্তিযুক্ত, তিনি সমস্যার সমাধান দেবেন, আর তার চারদিকের সবার কাছে নিজেকে এক উজ্জ্বল আদর্শের দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে তুলবেন।

অধিকন্তু, তাঁর নৈতিকভাবে উন্নত মহান চরিত্র আর আলাপচারিতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। যে উজ্জ্বলতা আর আলো তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার ও আচরণ থেকে বিকীর্ণ হয় তা মানুষকে এমনকি সংকটতম মুহূর্তেও আনন্দিত ও সুখী করে তোলে। এমনতর আচরণই এ পৃথিবীতে সুন্দর, শান্তিময় ও সম্মানিত জীবনের পথ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, আর আগত পরকালের আনন্দ ও আশীর্বাদে পূর্ণ জীবনের পথ সুগম করে দেয়। তাই, যাঁর আচরণ ও মানসিক অবস্থা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে সেই বিশ্বাসী বা মুমিনের জন্য দুঃখ বা দুর্ভাবনার কোন কারণ থাকতে পারে না ; এমন কিছু নেই যা তাঁকে নিরাশার অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ এভাবেই তা প্রকাশ করেছেন ঃ

> **আল্লাহ মোত্তাকীদের মুক্তি দেবেন সাফল্যের সাথে কোন কষ্ট তাদের স্পর্শ করবে না, এবং তারা চিন্তিতও হবে না।** [কোরআন : ৩৯:৬১]

তদুপরি, বিশ্বাসিগণের কাছে আনন্দ, সুখ, শান্তি আর নিরাপত্তা বেহেশতের জীবনের অবস্থাদির পার্থিব প্রতিফলন মাত্র। এ সুখানন্দগুলোর শুরু হয় এ পৃথিবীতেই আর যাঁরা আল্লাহতে বিশ্বাসী ও তাঁর উপর ভরসাকারী তাঁরা এই সুখের উপাদানগুলো পরিশেষে বেহেশতে গিয়ে খুজেঁ পাবেন যা অনন্তকাল টিকে থাকবে। বিশ্বাসিগণ পরকালীন জীবনে যে আশীর্বাদের দানগুলো উপভোগ করবেন তা কোরআন বর্ণনা করছে ঃ

> **"অতএব আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের বিপত্তি থেকে এবং তাদেরকে দিবেন চেহারায় উৎফুল্লতা ও অন্তরের আনন্দ।"** [কোরআন : ৭৬ : ১১]

অন্য এক আয়াতে শেষবিচার দিনের উপর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যকার পার্থক্যের কথা আল্লাহ বলেন ঃ

সেদিন অনেক মুখমন্ডল দীপ্তিমান হবে, হাস্যময়, প্রফুল্ল হবে, আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসরিত যার উপর কালিমা সমাচ্ছন্ন থাকবে। এরাই কাফের, পাপাচারী লোক। [কোরআন : ৮০:৩৮-৪২]

অবিশ্বাসীরা পরকালে দোযখের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পারবে, শয়তানের প্রলোভনে নিজেকে সমর্পণ করে অর্জিত এ দুঃখময় জীবন চলতে থাকবে অনন্তকাল, কিন্তু সেটি চলবে আরো বেশি তীব্র যন্ত্রণাসহ। অন্যদিকে, বেহেশতে বিশ্বাসিগণের উপভোগ্য আনন্দ ও সুখ নিরবচ্ছিন্নভাবে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে ঃ

যখন সেদিন আসবে, তখন কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কতক হবে দুর্ভাগা আর কতক হবে ভাগ্যবান। অতএব, যারা দুর্ভাগা তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ চলতে থাকবে।

সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে যতদিন আসমান ও জমিন বহাল থাকবে ; অবশ্য যদি আপনার রব অন্য কিছু ইচ্ছে করেন তবে ভিন্ন কথা। কেননা আপনার রব যা ইচ্ছে করেন তা-ই করেন।

আর যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও জমিন বহাল থাকবে ; অবশ্য যদি আপনার রব অন্যকিছু ইচ্ছে করেন তবে ভিন্ন কথা। এ দান অফুরন্ত, নিরবচ্ছিন্ন।

[কোরআন : ১১ : ১০৫-১০৮]

বিবর্তন মতবাদের ভ্রান্ত ধারণা

বলুন : আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন রব অন্বেষণ করব?

অথচ তিনিই সব কিছুর রব।

যে যা কিছু করে তা তারই উপর বর্তায় এবং কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের রবের কাছে, তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে।

[কুরআন : ৬ : ১৬৫]

ডারউইনবাদ নামে যে থিওরিটি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পথ অন্বেষণ করে তা আসলে অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা বা ভ্রান্ত বিশ্বাস বৈ আর কিছু নয়। প্রাণ অজৈব বস্তু থেকে যুগপৎ সংঘটনের মাধ্যমে উন্মেষিত হয়েছে বলে যুক্তি প্রদানকারী এ থিওরিটি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে তখনই, যখন স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এ বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেছেন আর এর যাবতীয় ছোট-বড় খুঁটিনাটি সব কিছু তিনিই পরিকল্পনা করেছেন। অতএব প্রাণসমূহ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি নয়, বরং তা এক আকস্মিক যোগাযোগের ঘটনায় উৎপত্তি লাভ করেছে – এ মতামত পোষণকারী বিবর্তনবাদটি কখনও সত্য হতে পারে না।

আশ্চর্য নয় যে, যখন আমরা বিবর্তন মতবাদটির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই যে এটা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো দ্বারাই বাতিল হয়ে যায়। প্রতিটি জীবের ডিজাইন অত্যন্ত জটিল আর চিত্তাকর্ষক। উদাহরণস্বরূপ, জড় জগতে অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে পাই যে কি এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর পরমাণুগুলো অবস্থান করে আছে এবং জীব জগতে আমরা লক্ষ্য করি যে, কেমন জটিল ডিজাইনের মাধ্যমে পরমাণুগুলো একত্রিত হয় আর কেমন অসাধারণ সে পদ্ধতিসমূহ ; আর আমিষ, এনজাইম আর কোষসমূহের গঠন যেগুলো এ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবে বিদ্যমান এ বিস্ময়কর ডিজাইন ডারউইনবাদকে অসিদ্ধ প্রমাণ করেছে।

আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের অন্যান্য গবেষণাগুলোয় সবিস্তারে আলোচনা করেছি এবং এভাবেই তা করে যাওয়া অব্যাহত রাখব। অবশ্য আমাদের ধারণা, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এনে এখানেও এর উপর একটি ছোট সারাংশ তৈরি করলে তা কাজে আসবে।

বৈজ্ঞানিকভাবে ডারউইনবাদের পতন

প্রাচীন গ্রীস থেকেই একটি মতবাদ হিসেবে চলে আসলেও বিবর্তন থিওরিটি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে যখন "প্রজাতির উৎস" নামক বইখানা প্রকাশিত হয়ে থিওরিটিকে বিজ্ঞান জগতে সর্বশেষ টপিকে নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতিকে

পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন – এটি ডারউইন তার এ বইখানায় অস্বীকার করেন। ডারউইনের মতানুসারে সব জীবেরই একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল এবং এরা কালের যাত্রায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ডারউইনের থিওরিটি কোন দৃঢ় বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল না ; তিনি নিজেও মেনে নিয়েছেন যে এটা ছিল নিছকই এক "অনুমান"। অধিকন্তু, ডারউইন তার "থিওরির প্রতিকূলতা" নামক বইখানার দীর্ঘ অধ্যায়সমূহে স্বীকার করেছেন যে, থিওরিটি বহু সমালোচনামূলক প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছিল।

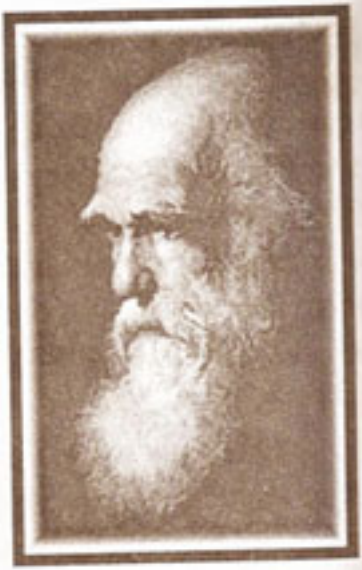

চার্লস ডারউইন

ডারউইন নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পানে তার সব আশা নিয়োগ করলেন, যেগুলো তার থিওরির প্রতিকূলতাগুলোর সমাধান নিয়ে আসবে বলে তার প্রত্যাশা ছিল।

বিজ্ঞানের মোকাবেলায় ডারউইনবাদের এ পরাজয়টিকে তিনটি মূল আলোচ্য বিষয়ে পুনর্নিরীক্ষণ করা যায় :

১. ভূপৃষ্ঠে প্রাণের উন্মেষ কিভাবে হল, এর ব্যাখ্যা মতাবাদটি কোনভাবেই প্রদান করতে পারে না।

২. থিওরিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত "বিবর্তন প্রক্রিয়াগুলোর" বিবর্তন ঘটানোর কোন প্রকার ক্ষমতা আদৌ আছে কি নেই - তা প্রমাণ করার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই।

৩. জীবাশ্ম রেকর্ডসমূহ বিবর্তন থিওরির প্রস্তাবনাসমূহের সম্পূর্ণ উল্টো তথ্য বা প্রমাণ সরবরাহ করে।

এ পরিচ্ছেদে আমরা এ তিনটি মূল বিষয় সাধারণ পরিধিতে পর্যবেক্ষণ করবঃ

অনতিক্রম্য প্রথম ধাপ : প্রাণের উন্মেষ

বিবর্তন মতবাদ শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে এটাই শুদ্ধ বলে ধরে নেয় যে, ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে আদি পৃথিবীতে আবির্ভূত একটিমাত্র জীবকোষ থেকেই সব জীবিত প্রজাতির বিকাশ ঘটেছে। কিভাবে একটিমাত্র কোষ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন জটিল প্রজাতির উদ্ভব হল, আর বিবর্তন বলে যদি কিছু ঘটেই থাকে তবে ফসিল রেকর্ডে কেনইবা এর সামান্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না – এ ধরনের কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মতবাদটি অক্ষম। যাই হোক, সর্বাগ্রে, উক্ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি অনুসন্ধান করতে হবে : কিভাবে এ "আদিকোষের" উৎপত্তি হল?

যেহেতু বিবর্তনবাদ সৃষ্টি কৌশলকে অস্বীকার করে আর অতি প্রাকৃতিক কোন প্রকার মধ্যস্থতাকে মেনে নেয় না, সেহেতু তা এতেই অটল থাকে যে, "আদিকোষ" কোন ডিজাইন, পরিকল্পনা বা কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এক আকস্মিক যোগাযোগের মধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ মতবাদ অনুযায়ী, যুগপৎ ঘটনাসমূহের ফলস্বরূপই নিশ্চিতভাবে জড়বস্তুগুলোই একটি জীবকোষের জন্ম দিয়েছে। যাহোক, এটা এমনকি জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে অনাক্রম্য নিয়মাবলীর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ একটি দাবি।

প্রাণী থেকে প্রাণীর উৎপত্তি

ডারউইন তার বইখানায় প্রাণের উদ্ভবের ব্যাপারটি কখনও উল্লেখ করেননি। জীবিত সত্তাগুলোর গঠন কাঠামো অত্যন্ত সরল – এ অনুমানের উপরই তার সময়কার বিজ্ঞানের আদি ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যযুগ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদনের নামে একটি থিওরি দাবি করে আসছিল যে, জড়বস্তুগুলো একত্রে মিলিত হয়েই জীবের উদ্ভব ঘটায়, আর এটি তখন বিস্তৃতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হত যে, ফেলে রাখা অতিরিক্ত খাবার থেকে পোকামাকড় আর গম থেকে ইঁদুর জন্ম নেয়। এ মতবাদটি প্রমাণের জন্য মজার মজার গবেষণা চালানো হত। একটি ময়লা কাপড়ের টুকরায় কিছু গম ফেলে রাখা হত আর কিছুক্ষণ পরেই তা থেকে ইঁদুর জন্ম নেবে বলে বিশ্বাস করা হত।

অনুরূপভাবে মাংস থেকে কীটের উৎপত্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদনের একটি প্রমাণ বলে ধারণা করা হত। অবশ্য মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে এটা বোঝা

গেল যে, কীটগুলো মাংসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির হয় না, বরং খালি চোখে দেখা যায় না – এমন কিছু লার্ভার আকারে মাছিগুলো কীটগুলোকে বহন করে নিয়ে আসে। এমনকি যে সময়ে ডারউইন তার "প্রজাতির উৎপত্তি" বইখানা লিখেন তখনও ব্যাকটেরিয়া জড়বস্তু থেকে জন্ম নেয় এমন একটি বিশ্বাস বিজ্ঞান জগতে বহুল প্রচলিত ছিল।

অবশ্য ডারউইনের বই প্রকাশনার মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় লুই পাস্তুর দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শেষে তার ফলাফল ঘোষণা করেন যা ডারউইনের মতবাদের ভিত্তি স্থাপনকারী এ স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদনকে মিথ্যা প্রমাণ করে। ১৮৬৪ সনে, সর্বোনে দেয়া এক বিজয়ী লেকচারে লুই পাস্তুর বলেন, "এ সরল গবেষণাটি থেকে প্রাপ্ত গুরুতর আঘাত থেকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদনের মতবাদটি আর কখনও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে না।"

বিবর্তন মতবাদটির সমর্থকগণ পাস্তুরের এ তথ্যগুলোকে দীর্ঘ সময় ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যখন জীবকোষের অতি জটিল গঠনের জট খুলে দিল, তার সাথে সাথে যুগপৎ ঘটনায় প্রাণের অস্তিত্বে আসার কাল্পনিক ধারণা সম্পূর্ণ অচলাবস্থার সম্মুখীন হল।

বিংশ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তহীন প্রচেষ্টা

খ্যাতনামা রুশ জীববিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওপারিন প্রথম সেই বিবর্তনবাদী, যিনি বিংশ শতাব্দীতে "প্রাণের উৎপত্তি" বিষয়টিকে নিয়ে আবার নতুন করে কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ সনে তিনি বিভিন্ন থিসিস নিয়ে এগিয়ে আসলেন আর প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, জীবকোষ যুগপৎ ঘটনায় উৎপন্ন হতে পারে। অবশ্য এবারও এ অনুসন্ধানগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল আর ওপারিনকে নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তিখানি করতে হল : "যাহোক, দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়তবা কোষের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যাটি জীবসমূহের বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের বেলায় সবচেয়ে অস্পষ্ট একটি পয়েন্ট হিসেবে রয়ে গিয়েছে।"[১৮]

ওপারিনের বিবর্তনবাদী অনুসারীগণ প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যাটির সমাধানকল্পে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ পরীক্ষাগুলোর মাঝে সবচেয়ে সুপরিচিত পরীক্ষাটি সম্পন্ন করেন ১৯৫৩ সনে আমেরিকান রাসায়নবিদ স্ট্যানলী মিলার। তিনি গবেষণার একটি সেট তৈরি

করলেন ; তার যুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীর আদি পরিবেশে কিছু গ্যাস বিদ্যমান ছিল যেগুলোকে তিনি তার সেটটিতে একসঙ্গে মেশালেন ও মিশ্রণটিতে শক্তি সরবরাহ করলেন। অবশেষে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের জৈব অণু (এমাইনো এসিড) উৎপন্ন করলেন যেগুলো প্রোটিনের গঠন কাঠামোতে বিদ্যমান থাকে। সে সময় এ পরীক্ষাটিকে বিবর্তনের সপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এ গবেষণাটি অগ্রহণযোগ্য বলে প্রকাশিত হল; কেননা গবেষণায় যে পরিবেশ ব্যবহৃত হয়েছিল তা পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা থেকে ছিল অনেক অনেক ভিন্ন।[১৯]

দীর্ঘ নীরবতার পর মিলার স্বীকার করে নিলেন যে, তিনি যে পরিবেশের মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন তা বাস্তবে নেই।[২০]

বিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দানে বিবর্তনবাদীদের পেশকৃত সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সান্ডিয়াগো স্ক্রিপস ইনস্টিটিউট থেকে ভূ-রসায়নবিদ, জেফরী বাদা, ১৯৯৮ সনে আর্থ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক অনুচ্ছেদে এ সত্যটি মেনে নিয়ে বলেন :

আজ এ বিংশ শতাব্দী ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালেও সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটির মুখোমুখি আমরা হচ্ছি, যেমনটি হয়েছিলাম এ শতকে প্রবেশের সময় ; সমস্যাটি হল : ভূপৃষ্ঠে প্রাণের সঞ্চার হল কিভাবে ?

জীবদেহের জটিল গঠন

প্রাণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিবর্তন মতবাদ এমন একটি বড় ধরনের অচলাবস্থায় সমাপ্ত হওয়ার একটি প্রাথমিক কারণ যেসব জীবগুলো অত্যন্ত সরল গঠনের বলে বিবেচনা করা হয়েছিল, সেগুলোরও অবিশ্বাস্য ধরনের জটিল গঠন রয়েছে। মানব-প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি সব পণ্যের চেয়ে একটি জীবকোষ অধিকতর জটিল। আজ এ সময়ে এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত

আলেক্সান্ডার ওপারিন

ল্যাবরেটরীগুলোতেও অজৈব বস্তুগুলোকে একত্রিত করে একখানি জীবকোষ তৈরি করা যায় না।

একখানি কোষ তৈরিতে প্রয়োজনীয় শর্তাদির পরিমাণ এত বিপুল যে এটাকে যুগপৎ ঘটনায় সংঘটিত হওয়ার ব্যাখ্যা দেয়াই ভার। কোষের গঠন কাঠামোতে ব্লক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে প্রোটিনগুলো, তাদের প্রতিটি গড়ে ৫০০ এমাইনো এসিড নিয়ে গঠিত ; যুগপৎভাবে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সে প্রোটিনগুলোর তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা $১০^{৯৫০}$ ভাগেরও এক ভাগ। গাণিতিকভাবে $১০^{৫০}$ ভাগের চেয়ে কম কিংবা ক্ষুদ্রতর যেকোন সম্ভাবনা বাস্তবে অসম্ভব।

কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত ডি. এন. এ. একটি অবিশ্বাস্য ডাটা ব্যাংক, যা বংশগতির সমস্ত তথ্যাবলী বহন করে থকে। গণনা করে দেখা গেছে যে, ডি. এন. এ.তে যে তথ্যাদি সংকলিত রয়েছে তা যদি লিপিবদ্ধ করা যেত তাহলে তা ৯০০ ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়ার এক বিশালাকার লাইব্রেরী তৈরি করত, যেখানে প্রতি ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়ায় রয়েছে ৫০০ পৃষ্ঠা।

এই পয়েন্টটিতে একটি উভয় সংকট তৈরি হয় : ডি. এন. এ. কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের কিছু প্রোটিনের (এনজাইম) সহায়তায় বিভাজিত হয়। আবার এ এনজাইমগুলো সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি হওয়ার যাবতীয় তথ্যাবলী ডি. এন. এ. এর গায়েই সংকলিত থাকে। আর এ তথ্যাবলী থেকেই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াগুলো বুঝে নেয়া যায়। দেখা যাচ্ছে যে, উভয়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আর তাই কোষ বিভাজনের সময় তাদের উভয়কে একই সঙ্গে বর্তমান থাকতে হবে। এ কারণেই প্রাণ নিজে নিজেই উৎপত্তি লাভ করবে – এরূপ কাল্পনিক সম্ভাবনাটি বাতিল হয়ে যায়। ক্যালিফোর্নিয়ায় সান্ডিয়াগো ইউনিভার্সিটির সুনামধন্য বিবর্তনবাদী, অধ্যাপক রেসলি অরগেল, সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনের ১৯৯৪ সনের সেপ্টেম্বরের প্রকাশনায় একটি আর্টিকেলে এ সত্যটি স্বীকার করে বলেন :

এটা একেবারেই অসম্ভব যে গঠনগতভাবে জটিল প্রোটিন ও এমাইনো এসিড উভয়েই একই সময়ে একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হবে। তদুপরি এদের একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব বলেই মনে হয়। আর তাই, প্রথম দৃষ্টিতে একজন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রাণ কখনও রাসায়ণিক পদ্ধতিতে তৈরি হতে পরে না।[২২]

বলতে দ্বিধা নেই যে, যদি প্রকৃতিগত কারণে প্রাণের উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তখন এটাই মেনে নিতে হবে যে, এক অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক উপায়েই প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। এ সত্যটুকু সুস্পষ্টভাবে সেই বিবর্তন মতবাদকে বাতিল ঘোষণা করে যার প্রকৃত উদ্দেশ্য "সৃষ্টিকর্ম" – কে অস্বীকার করা।

কাল্পনিক বিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ডারউইনের মতবাদকে বাতিল করে দেয় তা হল, "বিবর্তনের প্রক্রিয়াবলী" হিসেবে যে দুটি ধারণার অবতারণা করা হয়েছিল সেগুলোর বাস্তবে কোন বিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা নেই বলে বুঝা গিয়েছে।

ডারউইন "প্রাকৃতিক নির্বাচন" প্রক্রিয়াকে তার উত্থাপিত বিবর্তনবাদের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করান। তিনি এ পদ্ধতির উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা তার বইটির নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে উঠে : "প্রজাতির উৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে..... ।"

প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবেচনা করে যে, যেসব জীব অধিকতর শক্তিশালী ও যেগুলো তাদের আবাস ভূমির স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকতর উপযোগী বা যোগ্যতর বলে বিবেচিত হয়, তারাই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। উদাহরণ-স্বরূপ, কোন এক হরিণের পাল যখন অন্য কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হয়, তখন যে হরিণগুলো অধিকতর দ্রুতবেগে দৌড়ে যেতে পারে তারাই কেবল টিকে থাকবে। অবশ্য প্রশ্নাতীতভাবেই, এ পদ্ধতি কোন হরিণের মাঝে বিবর্তন ঘটায় না আর একে বিকশিত করে অন্য কোন প্রজাতি, যেমন, ঘোড়ায় রূপান্তরিত করে না।

অতএব বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নেই। ডারউইন নিজেও এ সত্যটি অবগত ছিলেন আর তাকে তার প্রজাতির উৎস নামক বইটিতে নিম্নলিখিত উক্তিখানি করতে হয়েছিল :

"প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুকূল বৈষম্য কিংবা বৈচিত্র্য না ঘটা পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না।"[২৩]

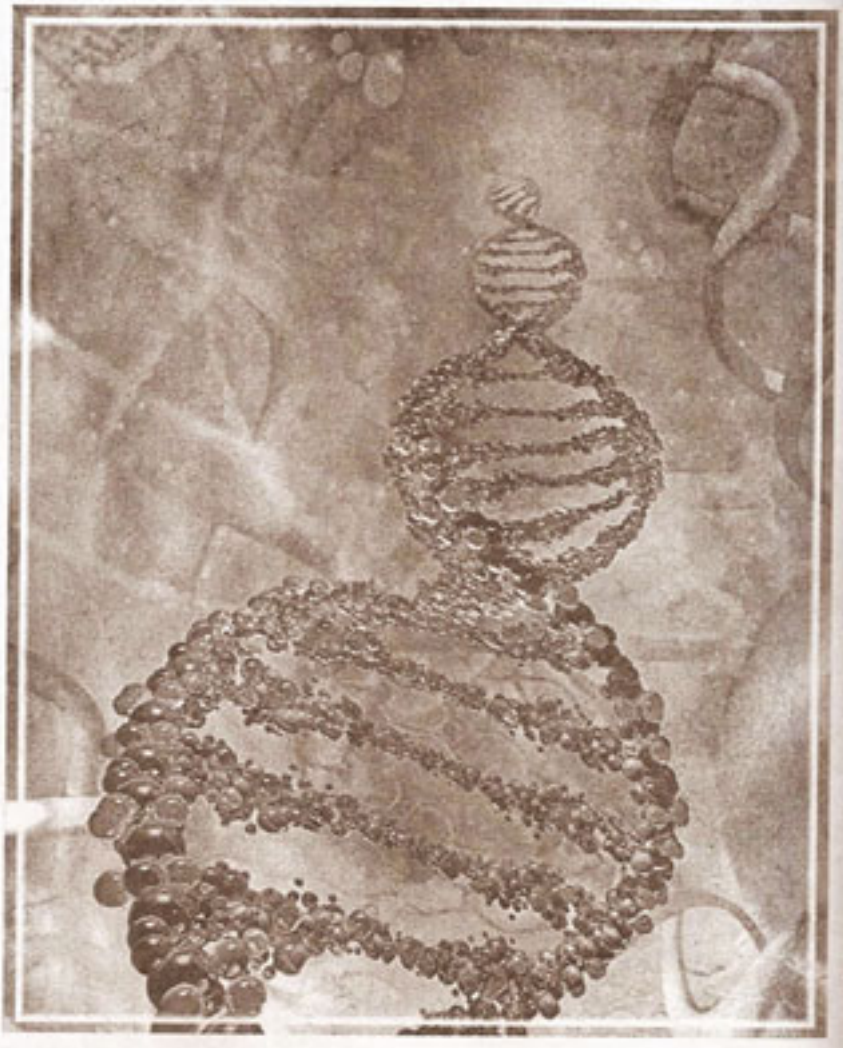

ল্যামার্কের প্রভাব

তাহলে কিভাবে এ "অনুকূল পরিবর্তনগুলো" ঘটবে ? ডারউইন তার যুগের বিজ্ঞানের আদি ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেন। ডারউইনের পূর্ব যুগে বিদ্যমান ফ্রান্সের জীববিজ্ঞানী ল্যামার্কের মতানুসারে, জীব তাদের জীবদ্দশায় তাদের অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করেছিল আর সেগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

একত্রীভূত হয়ে নতুন প্রজাতির প্রাণীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। যেমন, ল্যামার্কের মতে, জিরাফগুলো এক ধরণের কৃষ্ণকায় হরিণ থেকে বিকশিত হয়েছিল। যখন হরিণগুলো উঁচু বৃক্ষের পাতা খাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত, তখন তাদের ঘাড় একটু একটু করে প্রসারিত হয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম লম্বা হয়েছে।

ডারউইন নিজেও একই ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তার প্রজাতির উৎস বইটিতে বলেছেন যে খাবারের খোঁজে পানিতে নামতে গিয়ে কিছু ভালুক কালের পরিক্রমায় নিজেরাই তিমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

যাই হোক, বিংশ শতাব্দীতে ম্যান্ডেল উত্তরাধিকার সূত্রাবলী আবিষ্কার করলেন আর বংশানুগতির সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান কর্তৃক সে সূত্রগুলোর যর্থাতা যাচাই করা হল। বংশানুগতির বা উত্তরাধিকার সূত্রগুলো সে সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর অর্জিত বৈশিষ্ট্যাবলী পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরিত হয় – এ ধরনের উপাখ্যানটি নাকচ করে দেয়। এভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন, বিবর্তন প্রক্রিয়া হিসেবে সমর্থন পেতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

নব্য-ডারউইনবাদ এবং মিউটেশন

ডারউইন ভক্তরা ১৯৩০ সালের শেষ দিকে একটি সমাধানে পৌছার লক্ষ্যে "আধুনিক সংশ্লেষণ থিওরি" কিংবা আরো সাধারণভাবে যেটি নব্য-ডারউইনবাদ নামে পরিচিত, সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। নব্য-ডারউইনবাদে মিউটেশন প্রক্রিয়াটি যোগ করা হয় ; আর মিউটেশন হল, বাহ্যিক কিছু কারণ যেমন, বিকিরণের (Radiation) কিংবা সংযোজন ভ্রান্তির (Replication error) কারণে জীবদেহের জীনে সংঘটিত বিকৃতি ; উপরোক্ত ফ্যাক্টরগুলোর জন্য প্রাকৃতিক মিউটেশনের সঙ্গে "অনুকূল পরিবর্তনের কারণ" হিসেবে জীনে এ বিকৃতি ঘটে থাকে।

বর্তমানে এ পৃথিবীতে বিবর্তনের মডেল হিসেবে আমরা যেটিকে দেখতে পাই তাহল নব্য-ডারউইনবাদ। থিওরিটি এটাই বলে যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন জীব এসেছে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যদ্বারা জীবগুলোর জটিল অঙ্গাদি যেমন কান, চোখ, ফুসফুস আর পাখাসমূহে "মিউটেশন" কিংবা জীনগত বিশৃংখলা সংঘটিত হয়। তথাপি একটি নির্জলা বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা এ থিওরিটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে ঃ

মিউটেশন কখনো জীবদেহের বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটায় না বরং তার ক্ষতিসাধন করে।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ জন্ম নেয়া পঙ্গু বাচ্চা। এ ছবিটি প্রমাণ করছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানব দেহের উপর এ মিউটেশন প্রক্রিয়ার ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছে। অথচ বিবর্তনবাদীরা দাবি করেন যে, জীবের উৎপত্তির উপর মিউটেশন প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে

এর কারণটি অত্যন্ত সাধারণ ঃ ডি. এন. এ.-এর রয়েছে একটি অতি জটিল গঠন আর এলোপাতাড়ি যেকোন পরিবর্তন এ কাঠামোটির ক্ষতিসাধন করে। আমেরিকার জিনতত্ত্ববিদ বি. জি. রাঙ্গানাথান বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন ঃ

> মিউটেশন হল ক্ষুদ্র, এলোপাতাড়ি আর ক্ষতিকর প্রক্রিয়া। এগুলো কদাচিৎ ঘটে আর ঘটলেও ভাল লক্ষণ যে, এরা কার্যকরী হবে না। মিউটেশনের ৪টি বৈশিষ্ট্য এটাই সূচিত করে যে, প্রক্রিয়াটি কখনো বিবর্তনজনিত বিকাশ ঘটায় না। অত্যন্ত জটিল জীবদেহে এলোপাতাড়ি পরিবর্তনগুলো হয় ব্যর্থ নচেৎ ক্ষতিকর বলে পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘড়িতে এলোপাতাড়ি পরিবর্তন একে কোন উন্নতর ঘড়িতে রূপান্তরিত করতে পারে না। খুব সম্ভবত এতে ঘড়িটির ক্ষতি হবে অথবা বড়জোর তা ব্যর্থ হবে। ভূমিকম্প কখনও নগরীর সমৃদ্ধি ঘটায় না বরং এর ধ্বংসই ডেকে আনে।[২৫]

এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয় যে, মিউটেশনের কোন উদাহরণই কার্যকরী হয় না, তার মানে, মিউটেশন প্রক্রিয়া গায়ে বিদ্যমান সংকেতলিপির কোন প্রকার উন্নয়ন ঘটায় এমন কোন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় না। সব ধরনের মিউটেশনই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। মিউটেশনগুলো যাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া বলে উপস্থাপন করা হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে জীবদেহে জীনের কতকগুলো সংঘটন মাত্র, যেগুলো বরং দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলেই দেখা গিয়েছে। আর সাথে সাথে তা জীবগুলোকে অচল ও পঙ্গু করে দেয়। (মানব দেহে মিউটেশনের ক্ষতিকর প্রভাবের সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ ক্যান্সার) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া কখনো কোন "ক্রমবিকাশ পদ্ধতি" হতে পারে না। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচনও "নিজে নিজে কিছু করতে পারে না" যা ডারউইন নিজেও মেনে নিয়েছেন। এ তথ্যগুলো আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতিতে কোন "বিবর্তন প্রক্রিয়া" বিদ্যমান নেই। যেহেতু "বিবর্তনের কোন পদ্ধতিরই" অস্তিত্ব নেই সেহেতু বিবর্তন নামের কাল্পনিক কোন প্রক্রিয়াও সংঘটিত হয়নি।

ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ড ঃ মধ্যবর্তী কোন আকৃতির অস্তিত্ব নেই

বিবর্তন মতবাদ কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন দৃশ্যকল্প সংঘটিত হয়নি এ সত্যটির সবচেয়ে পরিষ্কার সাক্ষ্য বহন করছে "ফসিল রেকর্ড"।

বিবর্তন মতবাদ অনুসারে প্রতিটি জীব তার পূর্বসুরী থেকে জন্ম নিয়েছে। পূর্বে বিদ্যমান কোন প্রজাতি সময়ের ধারাবাহিকতায় অন্য কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে আর এভাবে বাকী প্রজাতিগুলোও অস্তিত্বে এসেছে। এ মতবাদ অনুসারে, এ রূপান্তর প্রক্রিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

এ যদি ব্যাপার হত তখন অবশ্যই অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব থাকত আর এরা দীর্ঘ পরিবর্তনকাল জুড়ে বর্তমান থাকত।

উদাহরণস্বরূপ, অতীতে কিছু অর্ধমাছ/অর্ধসরীসৃপ–এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকত তাদের পূর্ব থেকে বিদ্যমান মাছের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সরীসৃপের কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ হত। কিংবা কতক সরীসৃপ – পাখি জাতীয় প্রাণী থাকত যাদের পূর্বে রয়ে যাওয়া সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যের সাথে পাখির বৈশিষ্ট্য যোগ হত। যেহেতু এরা একরূপ থেকে অন্যরূপে উত্তরণের সময় জন্ম নিত সেহেতু

তাদের অক্ষম, ত্রুটিপূর্ণ পঙ্গু জীব হিসেবেই বিদ্যমান থাকার কথা। বিবর্তনবাদীরা এমন সব কাল্পনিক জীবের কথা বলে থাকেন যা অতীতে তাদের রূপ পরিবর্তনকালীন সময়ে "দুয়ের মধ্যবর্তী আকারে" (Intermediate forms) বিদ্যমান ছিল বলে তাদের বিশ্বাস।

সত্যিই যদি এ ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব থাকত, তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য হত মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন অবধি। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, অদ্ভুত এ প্রাণীগুলোর দেহাবশেষ ফসিল রেকর্ডে বিদ্যমান থাকার কথা। প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে ডারউইন বলেছেন :

> আমার থিওরিটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে একই গ্রুপের সব প্রজাতির মাঝে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনকারী মধ্যবর্তী গঠনের এ ধরনের প্রাণীর সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই হবে অসংখ্য .....। ফলস্বরূপ তাদের অতীতে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ কেবলমাত্র তাদের ফসিলসমূহ থেকে যেতে পারে।[২৬]

ডারউইনের স্বপ্ন ভঙ্গ

যদিও বিবর্তনবাদীরা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ফসিল খুঁজে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তথাপি এখনও পর্যন্ত কোথাও কোন অন্তর্বর্তীকালীন গঠনের প্রাণী খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাটি খুঁড়ে তুলে আনা সমস্ত ফসিলগুলো বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশার বিপরীত তথ্য প্রদর্শন করে এটাই প্রমাণ করছে যে, পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে আকস্মিকভাবে আর পরিপূর্ণ আকার নিয়ে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ জীবাশ্মবিদ, ডিরেক ভি. এগার নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও তিনি এ সত্যটি মেনে নিয়েছেন এভাবে :

> যে তথ্যটি বের হয়ে আসে তাহল যে, ফসিলগুলো বর্গ বা প্রজাতি – এ দুয়ের যে কোন পর্যায়েই থাকুক না কেন, যেকোন একটি স্তরে আমরা যদি এদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে বারংবার আমরা খুঁজে পাই, কোন ক্রমান্বয় বিবর্তন নয়, বরং এক গ্রুপের পরিবর্তে অন্য আরেকটি গ্রুপের যেন আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।[২৭]

ফসিল রেকর্ড থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত জীব প্রজাতিই কোন দুটি প্রজাতির অন্তর্বর্তীকালীন কোন গঠন নিয়ে নয় বরং পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছে। এটি ডারউইনের অনুমানের ঠিক উল্টো। এটি এ বিষয়টিরও একটি অত্যন্ত জ্বলন্ত প্রমাণ যে, সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমস্ত জীব যে পূর্ববর্তী কোন প্রজন্ম হতে বিকশিত হয়ে নয় বরং আকস্মিকভাবে এবং সম্পূর্ণ অখন্ডরূপে আবির্ভূত হয়েছে - তার একমাত্র ব্যাখ্যা এটিই হতে পারে যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুপরিচিত বিবর্তনবাদী ও জীববিদ ডগলাস ফুতুইমাও এ সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন :

ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে প্রাচীন যে স্তরটিতে প্রাণীর ফসিল রেকর্ড পাওয়া গিয়েছিল সেটি হল কেমব্রিয়ানের, যেটি ৫০০-৬০০ মিলিয়ন বছর পুরনো হবে বলে অনুমান করা হয়। এ স্তরটিতে প্রাপ্ত প্রাণীগুলোর ফসিল রেকর্ড থেকে এটাই বোঝা যায় যে জীবগুলো আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিল - এগুলোর পূর্বে বিদ্যমান কোন পূর্বপুরুষ ছিল না। কেমব্রিয়ান যুগে আবির্ভূত প্রাণীগুলোর মাঝে ট্রিলবিট একটি

> সৃষ্টি আর বিবর্তন – এ দুয়ের মাঝে প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যাগুলো ফুরিয়ে যায়। প্রাণীসমূহ পৃথিবীতে এসেছে হয় পূর্ণাঙ্গরূপে নচেৎ আসেনি। যদি তারা পূর্ণাঙ্গরূপে না আসে তবে তারা অবশ্যই পূর্বে বিদ্যমান কোন প্রজাতি থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে। যদি তারা পূর্ণাঙ্গরূপেই এসে থাকে তবে বাস্তবিকভাবে অবশ্য তারা কোন সর্বশক্তিমান মহাকৌশলী কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।[২৮]

ফসিলগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভূপৃষ্ঠে প্রাণসত্তার আবির্ভাব ঘটেছে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গরূপে। তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, "প্রজাতির উৎপত্তি" হয়েছে সৃষ্টি কৌশলের মধ্য দিয়ে, বিবর্তনের মাধ্যমে নয় ; আর এটা ডারউইনের অনুমানের ঠিক বিপরীত।

মানব-বিবর্তনের কাহিনী

মানবজাতির উৎস – এটিই বিবর্তনবাদ ভক্তদের সর্বাধিক উত্থাপিত আলোচনার বিষয়। ডারউইনের সমর্থকগণ এ বলে দাবি করেন যে, এখনকার মানবজাতি কিছু গরিলা বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রাণী থেকে বিকশিত হয়েছে। কথিত এ বিবর্তন প্রক্রিয়া ৪-৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল বলে দাবি করা হয়; আরো দাবি করা হয় যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার সময় এখনকার মানবজাতি তার ও তার পূর্বপুরুষদের মাঝামাঝি কোন "অন্তর্বর্তীকালীনরূপে" বিদ্যমান ছিল। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এ রূপরেখা থেকে চারটি মৌলিক শ্রেণীর একটি তালিকা তৈরি করা যায়:

১. অস্ট্রেলোপিথেকাস
২. হোমো হেবিলিস
৩. হোমো ইরেকটাস
৪. হোমো সেপিয়েনস

বিবর্তনবাদীগণ তথাকথিত মানবজাতির পূর্বপুরুষের নাম রেখেছেন "অস্ট্রেলো পিথেকাস" অর্থাৎ "দক্ষিণ আফ্রিকান বানর"। প্রকৃতপক্ষে, এ জীবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বানর বৈ কিছু নয়।

ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে দু'জন জগৎখ্যাত এনাটমিস্ট, লর্ড সলী যুকারম্যান এবং অধ্যাপক চার্লস অক্সনার্ড বিভিন্ন অস্ট্রেলোপিথেকাসের

নমুনার উপর গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, এগুলো সাধারণ এক প্রকার গরিলা শ্রেণীর ; এরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর মানবজাতির সাথে এদের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিবর্তনবাদীরা মানব বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়কে "হোমো" বা "মানুষ" নামে শ্রেণীকরণ করেছেন। তাদের দাবি অনুসারে হোমো শ্রেণীর জীবগুলো অস্ট্রেলোপিথেকাসের চেয়ে উন্নত পর্যায়ের। বিবর্তনবাদীরা এ প্রাণীগুলো বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম নিয়ে এদের নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজিয়ে এক অলীক বিবর্তন বিন্যাস বা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এ বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মাঝে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা এদের মাঝে বিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন প্রমাণ কখনো দাড় করানো যায়নি ; তাই এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তন মতবাদের একজন অগ্রবর্তী সমর্থক আর্নস্ট মায়ার তার দীর্ঘ বিতর্ক নামক বইটিতে লিখেছেন যে, "বিশেষত প্রাণী কিংবা হোমোসেপিয়েনসের উৎপত্তি বিষয়টি বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে ঐতিহাসিক (ধাঁধাঁগুলো), যা অত্যন্ত জটিল আর এরা এমনকি চূড়ান্ত সন্তুষ্টিজনক ব্যাখ্যাকেও প্রতিহত করতে পারে।"[৩০]

বিবর্তনবাদীগণ বিভিন্ন প্রজাতির মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী এ চেইনটির রূপরেখা টেনেছেন এভাবে ঃ

অস্ট্রেলোপিথেকাস > হোমো হেবিলিস > হোমো ইরেকটাস > হোমো সেপিয়েনস। এ চেইনটি থেকে বিবর্তনবাদীগণ দেখাতে চান যে, এ প্রজাতিগুলোর প্রত্যেকে একে অপরের আদি পুরুষ। অবশ্য বিবর্তনবাদীদের সাম্প্রতিককালের প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা প্রকাশিত হয়েছে যে, অস্ট্রেলোপিথেকাস, হোমো হেবিলিস আর হোমো ইরেকটাস পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বিদ্যমান ছিল।[৩১]

তদুপরি, হোমো ইরেকটাস নামে শ্রেণীকৃত মানুষের একটি নির্দিষ্ট অংশ এখনও আধুনিককাল পর্যন্ত বসবাস করে আসছে। হোমো সেপিয়েনস নিনদারথেলেনসিস ও হোমো সেপিয়েনস (আধুনিক মানুষ) একই সঙ্গে একই অঞ্চলে বসবাস করছিল।[৩২]

এ অবস্থা সুস্পষ্টভাবেই, প্রজাতিগুলোর একজন আরেকজনের উত্তরসূরী- এ দাবিটি দুর্বল করে দেয়। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জীবাশ্মবিদ, স্টীফেন জে গুল্ড, নিজে একজন বির্বতনবাদী হয়েও বিবর্তন থিওরির এ অচলাবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

> আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ধাপ কি হতে পারে যদি তিনটি হোমিনিড বংশানুক্রম (এ. আফ্রিক্যানাস, বিশাল অস্ট্রেলোপিথেসিনস, আর. এইচ. হেবিলিস) একই সঙ্গে বর্তমান থাকে আর স্পষ্টভাবে কেউই একজন আরেকজন থেকে জন্ম নেয়নি ? অধিকন্তু, পৃথিবীতে থাকাকালীন অবস্থায় এ তিনটি হোমিনিডের কেউই বিবর্তনের কোন প্রবণতাই দেখায়নি।[৩৩]

সংক্ষেপে বললে, মানব বিবর্তনের গল্পটি চালু রাখতে "অর্ধেক বানর, অর্ধেক মানুষ" এমনতর প্রাণীর বিভিন্ন ছবি এঁকে তা প্রচার মাধ্যম ও কোর্স বইতে হাজির করা হয় ; খোলাখুলি বলতে গেলে এগুলো নিছকই প্রচারণার মাধ্যমে করা হয় – যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন একটি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীদের মাঝে অন্যতম একজন লর্ড সলী যুকারম্যান এ বিষয়টির উপর বছরের পর বছর গবেষণা চালিয়েছেন, বিশেষ করে অস্ট্রেলোপিথেকাসের উপর ১৫ বছর ধরে কাজ করার পর নিজে একজন বিবর্তনবাদী হয়েও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "সত্যি বলতে কি, বানর সদৃশ প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত কোন বংশ তালিকার অস্তিত্ব নেই।"

যুকারম্যান একটি আকর্ষণীয় "বিজ্ঞানের পরিসরও" তৈরি করেছিলেন। তার মতে যা সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক তা থেকে শুরু করে যা সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক সে পর্যন্ত বিস্তৃত এ পরিসরটি তিনি গঠন করেন। এ পরিসরের প্রথম সারিতে থাকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো অর্থাৎ রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান – যেগুলো কি-না বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ডাটা ফিল্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলোর পর আসে জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান এবং তারপর সমাজ বিজ্ঞান। এ পরিসরের একদম শেষের দিকে আসে সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক বলে ধারণা করা হয় যে অংশগুলোকে, সেগুলো হল "অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি" – যেমন টেলিপ্যাথি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং পরিশেষে আসে "মানব বিবর্তন"। যুকারম্যান তার যুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> আমরা তখন ঠিক বস্তুনিষ্ঠ সত্যের তালিকা থেকে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা মানুষের ফসিলের ইতিহাসের ব্যাখ্যার মত অনুমান নির্ভর জীববিজ্ঞানের বিষয়গুলোর দিকে সরে যাই, যেখানে একজন বিশ্বাসী (বিবর্তনবাদী) লোকের কাছে সবকিছুই সম্ভব বলে বিবেচিত হয়, আর যেখানে (বিবর্তনে) অতি ভক্তরা কখনো কখনো একই সময়ে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ব্যাপারও বিশ্বাস করতে সক্ষম হয়।[৩৪]

মানবজাতির বিবর্তনের গল্প গুটিকয়েক অন্ধ বিবর্তনবাদ ভক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মাটি খুঁড়ে তুলে আনা ফসিলের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যাই দিয়েছে শুধু, কোন সফলতা খুঁজে পায়নি।

চক্ষু ও কর্ণের টেকনোলজি

চোখ ও কানের অসাধারণ উপলব্ধি ক্ষমতা হল আরেকটি বিষয় – যা সম্পর্কে বিবর্তন থিওরি নিরুত্তর থেকে যায়।

চক্ষু সম্পর্কিত বিষয়ে যাওয়ার আগে চলুন, "আমরা কি প্রক্রিয়ায় দেখতে পারি ?" – এ প্রশ্নটির একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করি। কোন একটি বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি চোখের রেটিনার (অক্ষি গোলকের সর্ব পিছনের স্তর) উপর গিয়ে ঠিক উল্টোভাবে পতিত হয়। এখানে পতিত আলোকরশ্মিগুলো কিছু কোষের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয় এবং পরে তারা "দৃষ্টির কেন্দ্র" নামে মস্তিষ্কের পশ্চাৎদিকের একটি ছোট এলাকায় গিয়ে পৌছে। মস্তিষ্কের কেন্দ্রে এ ইলেকট্রিক সিগন্যালগুলো বিভিন্ন ধারাবাহিক পরিবর্তনের পর একটি ইমেজ বা প্রতিবিম্ব হিসেবে গৃহীত হয়। চলুন, এ টেকনিক্যাল পটভূমি সম্পর্কে আমরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি।

মস্তিষ্ক আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। তার মানে হল, মস্তিষ্কের ভিতর ভাগটা ঘন অন্ধকার আর যে জায়গাটিতে মস্তিষ্ক থাকে সেখানে আলোক পৌছে না। "দর্শনের কেন্দ্র" নামক স্থানটি একটি ঘন অন্ধকার জায়গা যেখানে কখনো আলো পৌছে না ; এমনকি এটি আপনার জানা সমস্ত জায়গাসমূহের মাঝে সবচেয়ে অন্ধকার জায়গাও হতে পারে। যাই হোক, আপনি এ ঘন কালো অন্ধকারের মাঝেই একটি উজ্জ্বল আলোকিত জগৎ দেখতে পান।

চোখে তৈরি ইমেজ এত তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার যে এমনকি বিংশ শতাব্দীর টেকনোলজিও তা অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি আপনার বইটির দিকে তাকান, যে হাতগুলো দিয়ে বইটি ধরে আছেন সেগুলোর দিকেও তাকান, তারপর আপনার মাথা উঠিয়ে আপনার চারপাশে লক্ষ্য করুন। আপনি কি কখনো অন্য কোথাও এটির মত এমন তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ ইমেজ দেখেছেন ? এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নির্মাতাদের তৈরি সবচেয়ে প্রাগ্রসর টেলিভিশন পর্দাও আপনার জন্য এমনতর তীক্ষ্ণ ইমেজ

তৈরি করতে পারে না। এটি হল, ত্রি-মাত্রিক, রঙ্গিন আর অত্যন্ত সার্প বা তীক্ষ্ণ ইমেজ। একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এমনতর স্বচ্ছতা অর্জন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার। কারখানা, বড় বড় জায়গা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক গবেষণা করা হয়েছে, এ উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা ও ডিজাইন করা হয়েছে। আবার টিভি পর্দা এবং আপনার হাতে ধরা বইটির দিকে তাকান। তীক্ষ্ণতা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আপনি বিরাট এক পার্থক্য খুঁজে পাবেন। অধিকন্তু, টেলিভিশন পর্দা আপনাকে দ্বি-মাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে, যেখানে আপনার চোখ দিয়ে গভীরতাসহ একটি ত্রি-মাত্রিক ছবি আপনি দেখতে পান।

বহু বছর ধরে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার একটি ত্রি-মাত্রিক টেলিভিশন তৈরির আর চোখের সমান দর্শন গুণ অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। হ্যাঁ, তারা ত্রিমাত্রিক একটি টেলিভিশন সিস্টেম আবিষ্কার করেছেন বটে ; তবে তা একটি কৃত্রিম ত্রি-মাত্রা মাত্র। পশ্চাৎপটি অধিকতর ঘোলাটে, পুরোভূমিটি একটি পেপার সেটিং এর মত দেখা যায়। চোখের ন্যায় স্বচ্ছ আর পরিষ্কার ছবি তৈরি করা কখনো সম্ভব হয়ে উঠেনি। ক্যামেরা ও টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই ইমেজ কোয়ালিটি হ্রাস পেয়েছে।

যে পদ্ধতিটি এ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছবি তৈরি করে তা হঠাৎ করেই গঠিত হয়েছে বলে বিবর্তনবাদীগণ দাবি করেন। এখন কেউ কেউ যদি আপনাকে বলেন যে আপনার কক্ষের টেলিভিশনটি আকস্মিক সম্ভাবনার একটি ফলাফল, এর সমস্ত পরমাণুগুলো হঠাৎ করেই এক সঙ্গে আসতে লাগল আর ইমেজ তৈরি করার এ যন্ত্রটি তৈরি করল, আপনি কি ভাববেন ? হাজারো লোক যা পারে না, তা কিভাবে পরমাণুগুলো সম্পন্ন করতে পারে ?

যে যন্ত্র চোখের তৈরি ছবির তুলনায় সাদামাটা সেকেলে ছবি তৈরি করে তা যদি যুগপৎ সম্ভাবনায় তৈরি না হতে পারে তাহলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, চোখ এবং চোখ দ্বারা দৃষ্ট ছবি হঠাৎ করেই সৃষ্টি হতে পারত না। কানের বেলায়ও একই পরিস্থিতি খাটে। বহিঃকর্ণ অরিকলের মাধ্যমে শব্দ গ্রহণ করে তা মধ্যকর্ণের দিকে পরিচালিত করে ; মধ্যকর্ণ শব্দ কম্পনকে আরো তীব্রতর করে অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে ; অন্তকর্ণ এ শব্দ কম্পনগুলোকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করে মস্তিষ্কে পাঠায়। ঠিক চোখের মতই মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রে শ্রবণ কাজটি সম্পন্ন হয়।

চোখের পরিস্থিতিটি কানের বেলায়ও সত্য। অর্থাৎ চোখ যেমন আলো থেকে

সংরক্ষিত, ঠিক তেমনি কানও শব্দ থেকে সংরক্ষিত কোন প্রকার শব্দকে তা ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। সুতরাং বহির্জগৎ যতই কোলাহলপূর্ণ হোক না কেন, মস্তিষ্কের ভেতরভাগে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে। তথাপি তীক্ষ্ণতম শব্দগুলো মস্তিষ্কের ভেতরেই উপলব্ধি করা হয়। শব্দ থেকে সংরক্ষিত আপনার এ মস্তিষ্কে আপনি শুনতে পান অর্কেস্ট্রার ঐকতান আর জনবহুল জায়গার সমস্ত শব্দই আপনার মস্তিষ্ক শ্রবণ করে। অবশ্য যদি ঠিক সে মুহূর্তে কোন সঠিক যন্ত্র দিয়ে আপনার মস্তিষ্কের শব্দ মাত্রা মেপে দেখা হত তবে দেখা যেত যে ঐ এলাকায় পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

ঠিক চিত্রকল্পের বেলায় যেমনটি হয়েছে, তেমনি মূল শব্দের ন্যায় যথাযথ শব্দের উৎপাদন আর পুরুৎপাদনের চেষ্টায় দর্শক দশকের সাধনা ব্যয় করা হয়েছে। এসব প্রচেষ্টারই ফলাফল হল – সাউন্ড রেকর্ডার, হাই-ফাই আর শব্দের অর্থ বুঝার সিস্টেম। সমস্ত টেকনোলজির প্রয়োগ আর এ প্রচেষ্টায় সহস্র সহস্র ইঞ্জিনিয়ার আর এক্সপার্টগণ কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মানুষের কান দিয়ে শ্রুত শব্দের সমান তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতাসম্পন্ন শব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বৃহৎ কোম্পানিগুলোর তৈরি সবচেয়ে উঁচুমানের গুণসম্পন্ন হাই-ফাইগুলোর কথা ভাবুন। এমনকি এ যন্ত্রগুলোয় যখন শব্দ রেকর্ড করা হয় তখন শব্দের কিছু গুণ হারিয়ে যায় ; কিংবা যখন আপনি হাই-ফাই টি অন করেন, তখন মিউজিক শুরু হওয়ার আগে হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পাবেন। যাই হোক, মানব দেহের টেকনোলজির মাধ্যমে উৎপন্ন শব্দগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর পরিষ্কার। মানুষের কান কখনো শব্দ শোনার সময় হাই-ফাই-এর মত হিস্ হিস্ শব্দ কিংবা আবহ-তড়িৎ জনিত পট্ পট্ শব্দ শোনে না ; মানুষের কান শব্দটি স্বাভাবিকভাবে যেমন ঠিক তেমনিরূপে শুনে থাকে, ঠিক তেমনি তীক্ষ্ণ আর স্বচ্ছ। মানুষের জন্মলগ্ন থেকে এটা এমনিভাবেই হয়ে আসছে।

এ পর্যন্ত, সেন্সরি ডাটা উপলব্ধির ব্যাপারে মানুষের কান ও চোখ যেমন সুবেদী (সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে সক্ষম) আর সফল, মানুষ তেমনতর কোন দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কিংবা কোন রেকর্ডিং যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

যাই হোক, দর্শন আর শ্রবণের ব্যাপারে সব কিছুর বাইরেও এক বিরাট সত্য নিহিত রয়েছে।

যে চেতনাটি দর্শন ও শ্রবণ করে থাকে - সেটি কার ?

মস্তিষ্কের ভেতর কে মোহময় পৃথিবী দর্শন করে, কে শোনে ঐকতান আর পাখির কিচির-মিচির, আর কেই-বা গোলাপের সুবাস নেয় ?

মানুষের চোখ, কান আর নাক থেকে আগত উত্তেজনা/উদ্দীপনা ভ্রমণ করে বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়বীয় তারণা হিসেবে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছে। কিভাবে মস্তিষ্কে এ ইমেজগুলো তৈরি হয়- এ সম্পর্কে বহুবিধ বর্ণনা আপনি বায়োলজি, ফিজিওলজি আর বায়োকেমিস্ট্রি বইতে খুঁজে পাবেন। কিন্তু আপনি কখনও এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য খুঁজে পাবেন না। কে সে জন যে মস্তিষ্কে এ বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়ুবীয় উত্তেজনাগুলোকে ছবি, শব্দ, ঘ্রাণ কিংবা স্নায়ুবীয় ঘটনা হিসেবে উপলব্ধি করে থাকে ? মস্তিষ্কের ভেতরে একটি চেতনা থাকে, যে চোখ, কান, নাকের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সব জিনিস উপলব্ধি করে থাকে। এ চেতনাটি আসলে কার ? কোন সন্দেহ নেই যে, এটি মস্তিষ্ক গঠনকারী নার্ভ বা স্নায়ু, চর্বি স্তর কিংবা স্নায়ু কোষের নয়। এ কারণেই ডারউইন সমর্থক বস্তুবাদীগণ – যারা সবকিছু বস্তু দিয়ে তৈরি বলে বিশ্বাস করেন, তারা কখনও এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন না।

এ সচেতনতাবোধটি আসলে আত্মা বা স্পিরিটের যাকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। ছবি দেখার জন্য আত্মাটির চোখ লাগে না কিংবা শব্দ শুনতে কানের দরকার পড়ে না। উপরন্তু, চিন্তা-ভাবনা করতে তার কোন মস্তিষ্কের দরকার হয় না।

যিনিই এ স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক সত্যটি পড়বেন, তারই উচিত হবে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করা, তাঁকেই ভয় করা, আর তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। তিনিই মস্তিষ্কের মাত্র কয়েক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের আলকাতরা কালো জায়গাটিতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডকে ত্রি-মাত্রিক, বর্ণিল, ছায়াময় আর আলোকোজ্জ্বলরূপে সংকুচিত ও ছোট করে আনেন।

বস্তুবাদী বিশ্বাস

এতক্ষণ আমরা যে তথ্য উপস্থাপন করেছি, তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিবর্তন থিওরি এমনি একটি দাবি, যার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের পাওয়া তথ্যের

স্পষ্টভাবেই কোন সাদৃশ্য নেই। প্রাণীর উৎপত্তি সম্পর্কে থিওরিটির দাবি বিজ্ঞানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এর প্রস্তাবিত বিবর্তনের পদ্ধতিগুলোর বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই নেই, আর ফসিলগুলো প্রমাণ করছে যে, মতবাদটির জন্য প্রয়োজনীয় অর্ন্তবর্তীকালীন আকার বা গঠনের কোন প্রাণী কখনও বিদ্যমান ছিল না তাই এটাই বাস্তব যে, বিবর্তন থিওরিকে অবৈজ্ঞানিক ডাটা বলে পরিত্যাগ করা উচিত। এমনভাবে তা করা উচিত যেমনভাবে সমগ্র ইতিহাস জুড়ে পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মডেলটি বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচিতে বিবর্তন মতবাদকে সাগ্রহেই বহাল রাখা হচ্ছে। কিছু কিছু লোক এমনকি থিওরিটির সমালোচনাগুলোকে "বিজ্ঞানের প্রতি আক্রমণ" হিসেবে উপস্থাপনার প্রয়াস চালায়। কিন্তু কেন ?

কারণটি হল, বিবর্তন মতবাদ একই সূত্রে গাঁথা (একই মতাবলম্বী) কিছু লোকের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় অন্ধ বিশ্বাস। এরা অন্ধভাবে বস্তুবাদ দর্শনের অনুরক্ত, আর তারা ডারউইনবাদকে এজন্য সমর্থন করে কেননা এটাই একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যা প্রকৃতিতে ব্যবহারের জন্য সহজেই পেশ করা যায়।

যথেষ্ট কৌতূহলের ব্যাপার যে তারা আবার সময়ে সময়ে এ সত্যটি স্বীকারও করে থাকে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রখ্যাত জীন তত্ত্ববিদ, খোলাখুলি বিবর্তনবাদী হিসেবে পরিচিত, রিচার্ড সি. লিওনটিন স্বীকার করেছেন যে তিনি "সর্বাগ্রে একজন বস্তুবাদী এবং তারপর একজন বিজ্ঞানী"। তিনি বলেন ঃ

> "এটা এমন নয় যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর বস্তুবাদ ব্যাখ্যা গ্রহণে কোনভাবে বাধ্য করেছে, বরং, উল্টো, পার্থিব জিনিসের প্রতি আমাদের নিজেদের প্রধান মোহ থাকার কারণে আমরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরঞ্জাম ও কিছু ধারণার সেট তৈরি করতে বাধ্য হয়েছি যেগুলো বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদান করে, তা যতই হোক অন্তর্জ্ঞানের পরিপন্থী কিংবা যতই ধাঁধাঁ লাগানো হোক তা অদীক্ষিতদের জন্য – তাতে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। অধিকন্তু বস্তুবাদই আসল ও সবকিছু, তাই আমারা আমাদের দোড় গোড়ায় স্বর্গীয় পদচারণা মেনে নিতে পারি না।"

এ সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র বস্তুবাদ দর্শনে আসক্ত থাকার কারণেই ডারউইনবাদ নামক এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাসকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এ বিশ্বাসটি এটাই বলতে চায় যে, "বস্তু ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই"। তাই এ মতবাদে তর্ক করে বলা হয় যে, "জড় ও অচেতন বস্তু থেকেই প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে"।

পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পোকা-মাকড়, বৃক্ষ, ফুল, তিমি ও মানবজাতি – এ ধরনের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাতিসমূহ জড় পদার্থ থেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, যেমন বৃষ্টিধারা, বজ্রপাত ইত্যাদি ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে – এটাই জোর দিয়ে প্রচার করে যাচ্ছে মতবাদটি। এটা যুক্তি ও বিজ্ঞান উভয়ের পরিপন্থী এক ধরনের অনুশাসন। তথাপি, ডারউইনবাদীগণ এ মতবাদটি সমর্থন করেই যাচ্ছে যেন তাদের "দোরগোড়ায় স্বর্গীয় পদচারণা মেনে নিতে" না হয়।

যারা বস্তুবাদে পক্ষপাত নিয়ে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত না করবেন তারাই এ পরিষ্কার সত্যটুকু দেখতে পারবেন ঃ সকল জীব একজন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কর্ম, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী এবং সবজান্তা। এ স্রষ্টাই হলেন, আল্লাহ। যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন, এর ডিজাইন করেছেন অত্যন্ত নিখুঁতরূপে আর সকল জীবের আকার দিয়েছেন।

তারা বলল ঃ আপনি পবিত্র। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

[কোরআন : ২ : ৩২]